রূপান্তরে শান্তিনিকেতন

বুদ্ধদেব আচার্য

দেবতীর্থ হিমালয়ে এসেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সঙ্গে আছেন তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়। একদিন মহর্ষিদেব ঝর্নার ধারে তন্ময়চিত্তে নদীর প্রবাহ লক্ষ্য করছেন—এমন সময়ে তাঁর অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ বাণী শুনলেন—"তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মতো নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।"[১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বেদ জীবনের এই সন্ধিক্ষণটি ছিল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এরপর নিদ্রাহীন চক্ষে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। ব্যাকুল হৃদয়ে কিশোরী চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। পথ বড় বিপদসংকুল—সিপাহী বিদ্রোহে অশান্ত ভারতবর্ষ ; তথাপি বহু আয়াসে দৈব নির্দেশ মাথায় করে কলকাতায় ফিরে এলেন।

আবার শুরু হল ঈশ্বর অন্বেষণের পালা। কখনো গঙ্গাবক্ষে, কখনো নিভৃত স্থানে ঈশ্বর সান্নিধ্যের ব্যাকুলতা—এই ভাবেই একদিন চলে এলেন বর্ধমানে। সেখানেও কিছু হল না। ঘুরতে ঘুরতে এলেন কুনুর নদীর তীরে গুসকরার অরণ্যবেষ্টিত স্থানে, সাধনার আসন পাতলেন সেখানে—কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না। ফের চলার শুরু—অজয় নদ অতিক্রম করে এলেন বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবারে।

রায়পুর হল অজয় নদের তীরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানে ছিল সিংহ পরিবারের জমিদারি। তাঁদের ছিল নীল, গড়াকাপড়, চিনি উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানির কারবার। অভিজাত এবং শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত সিংহ পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের একটা যোগসূত্র ছিল। সেই যোগসূত্রের প্রধান ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়। উনিশ শতকের ধর্ম আন্দোলনের সময় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি, ভুবনমোহন সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কলকাতায় থাকাকালীন মহর্ষিদেবের নিকট ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অতএব শিষ্যগৃহ রায়পুরে গুরুদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনে সমাদরে কোনো ত্রুটি ছিল না। সিংহ পরিবারের চকমিলান দালান কোঠার দোতলায় মহর্ষিদেবের থাকার সুব্যবস্থা হল।

দালান কোঠার ছাদ থেকে দেখা যায় বিস্তৃত অজয়ের আঁকাবাঁকা যাত্রাপথ। মনোরম সৌন্দর্য—অরণ্যবেষ্টিত বন জঙ্গলে ঘেরা অজয় নদ, কোথাও বিস্তৃত বালির চর। অভ্রের প্রাচুর্য হেতু সেগুলি সূর্যালোকে চকচক করছে। নদীর আঁকাবাঁকা পথে পালতোলা নৌকার বাণিজ্যবহর এগিয়ে চলেছে কাটোয়ায় গঙ্গার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে যাবে কলকাতার বন্দরে। মহর্ষিদেব এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ—তাই রায়পুরে এলেই নির্দিষ্ট এই কক্ষেই তিনি থাকতেন।

রায়পুরে ছিল সিংহ পরিবারের 'পুষ্পকানন'। সেখানে অশোকবৃক্ষের ছায়ায় শ্রীকণ্ঠ সিংহ

মহাশয়ের সঙ্গে চলত ঈশ্বরীয় বিষয়ে আলোচনা। কখনো ব্রহ্মসংগীত, কখনো ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হয়ে আনন্দরূপ অমৃত আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে উভয়ে হৃদয় বন্ধনে একাকার হয়ে যেতেন। এ ভাবে উভয়ে উভয়ের বড় কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এখানেও সব পেলেন না—আবার যাত্রা শুরু। সাধনার উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানে এলেন তাঁদের জমিদারিভুক্ত নির্জন 'শান্তিনিকেতনে'। এও যেন এক অজানা রহস্যময় ঘটনা। কারণ একদা শান্তিনিকেতন ছিল "এক ভদ্রবংশীয় বামাচারী তান্ত্রিকের সাধনক্ষেত্র।" ছাতিমতলা ছিল সাধকের সিদ্ধাসন। এখানেই তিনি সাধনার আসন পাতলেন। এই সিদ্ধাসনেই লাভ করলেন "আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ।" তাঁর অভীষ্ট লাভ হল। হিমালয়ে প্রাপ্ত দৈবাদেশের পূর্ণতা এল তাঁর হৃদয়ে।

পিতামহীর মৃত্যর পর থেকেই শ্মশানবৈরাগ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পিছু ছাড়া করে নি। সংসারের অনিত্যবোধ থেকে পরম সত্যকে জানা ও উপলব্ধির প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁর সংসারী জীবন ও সাধনা সমানভাবে বয়ে গিয়েছিল। এ জন্য পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের আকস্মিক প্রয়াণের শোক, আর্থিক সংকট, বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েও তাঁর পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। প্রায় সব হারিয়েও ঈশ্বরের কাছে কোনো অভিযোগ করেন নি—এতে তাঁর অভীষ্ট প্রাপ্তির পথই সুগম হয়েছিল। এই চরম দুর্দিনে ঝড়ের সন্ধ্যায় ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং" পাতাটি—যখন তাঁর হাতে এল, তখন তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ঈশ্বরীয় বাণীর পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে গেল রাঢ়ভূমির শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায়। জীবনের অনেক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে তাঁর বোধি উপলব্ধ হল সপ্তপর্ণের সিদ্ধাসনে। এ যেন দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা—ফলে শান্তিনিকেতনের 'সপ্তপর্ণ' বা ছাতিমগাছ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনক্ষেত্রের 'বোধিবৃক্ষরূপে' আজও পবিত্র হয়ে আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষ হয়েছিল ঠাকুরমার মৃত্যুর পর। জীবনবোধের ভাবনাটাই প্রতিনিয়ত তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। ভারতের সাধন পরম্পরার বিচিত্র গতি, নানা মতে, নানা পথ পরিক্রমায় কোনো বাধা হয়ে ওঠে নি। 'ভুক্তি ও মুক্তি' —এ মতেও কোনো বিরোধ হয় নি। মহর্ষিদেব সংসারে থেকেই দুটি ধারাকে ধরে রেখেছিলেন তাঁর জীবনে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের বাণীর বা দর্শনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে।

সে কারণেই বোধহয় তাঁর অন্তরের বৈরাগ্যের প্রতীক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর চতুর্দশতম সন্তান রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরে পরেই শান্তিনিকেতনে তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। এও যেন দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। ইতিহাসের সন তারিখ দিয়ে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যাবে না ঠিকই—কিন্তু 'রূপান্তরে শান্তিনিকেতন' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে এ সত্য অপরিহার্য বললে অতিশয়োক্তি হয় না।

মহর্ষিদেবের আধ্যাত্মিক সাধনার অভিব্যক্তি ঘটল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আত্মভোলা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে। বীরভূমের রাঙামাটির দেশে সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতন প্রায় 'শ্রীহীন' অবস্থায় পৌঁছেছিল। মহর্ষির ইচ্ছার বাস্তব রূপদান করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির সাধনভূমি

আশ্রমরূপে রূপান্তরিত হল ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৫ই কার্তিক—বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। পিতার নির্দেশে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে 'ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম'রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমে প্রথম আচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এরপর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর বা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ১৮৯১ সালের ২১শে ডিসেম্বর বা ১২৯৮ সলের ৭ই পৌষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করলেন। আশ্রমের 'ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠার সময় সকালের উপাসনায় বেদী অলঙ্কৃত করেন পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং আর্যসমাজের বৈদিক পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মহাশয়।

মহর্ষির শান্তিনিকেতন এরপর নতুন নতুন পরিচয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে গেল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই পৌষ 'মন্দিরের' উপাসনার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌষমেলার সূচনা হল। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকিভাবে রাঢ়ভূমির শান্তিনিকেতনে থাকতে লাগলেন। 'ব্রাহ্ম আশ্রমে' ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপন করলেন। যদিও পিতামহের ইচ্ছায় বলেন্দ্রনাথ প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে তা আর রূপায়িত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপন করে ধর্মীয় আশ্রমকে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে' রূপ দিলেন। এরপর ব্রহ্মবিদ্যালয় বিশ্বভারতী রূপে ১৯২১ সালে নবকলেবর ধারণ করে।

রবীন্দ্রনাথের ঋষিসত্তা ও বিশ্বকবিরূপে প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'নোবেল পুরস্কার' লাভের 'মধ্যে দিয়ে মহর্ষির শান্তিনিকেতন ক্রমে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শান্তিনিকেতন হবে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। ঋষিকবির অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা শান্তিনিকেতন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হল। মহর্ষির শান্তিনিকেতন থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনা আরম্ভ হল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হলে শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্ত রচনায় মতভেদ সৃষ্টি হত না। শান্তিনিকেতনে 'ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম' আর পাঁচটি প্রত্নবস্তুরূপেই ইতিহাসের পাতায় হয়তো লিপিবদ্ধ হয়ে থাকত। তাই "রূপান্তরে শান্তিনিকেতন" প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে একটু পিছন ফিরে "মহাজন সিদ্ধান্ত" নিয়ে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেই আমরা অগ্রসর হবো।

রবীন্দ্রনাথ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" গ্রন্থে শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন—"আমার পিতৃদেব ও রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি ছাতিমগাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁছেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন।"[২]

রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন—"শান্তিনিকেতন আবিষ্কারের ইতিহাসটি এই : "রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একদিন সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে যুগসন্তর্পণ ছায়ায় তিনি ক্ষণকালের মতো দাঁড়াইলেন। সমস্ত প্রান্তরের মধ্যে তখন ঐ দুটি মাত্র গাছ ছিল......এই জায়গাটি হঠাৎ তাঁহার মনকে টানিল। এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাঁহার নির্জন সাধনার উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল। ...শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙ্গা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। ...দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতদলের সর্দার ধরা দিল; ডাকাতি ব্যবসা ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল। যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা তাহাই হইল পরম আশ্রয়ের জায়গা আশ্রম।"[৩]

প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে লিখেছেন—"বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুর যাইবার পাকা সড়ক আছে—এই সড়ক ধরিয়া রায়পুর গেলে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ পড়িবার কথা নয়। তবে মহর্ষির পথে এই মাঠ পড়িল কেমন করিয়া? আমার বিশ্বাস কোন একবার পশ্চিম হইতে ফিরিবার সময়ে মহর্ষিদেব আহম্মদপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতেছিলেন। সিউড়ি হইতে বোলপুর হইয়া রায়পুর যাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া চলিলে পথে শান্তিনিকেতনের মাঠ অতিক্রম করিতে হয়।"[৪]

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"মহর্ষির বোলপুর আগমন।" আমাদের মনে হয় মহর্ষি আহম্মদপুরের পথে রায়পুরে আসেন। কাটোয়া পর্যন্ত নদীপথে আসিয়া কাটোয়া গুনুটীয়া সুরুল পথটিও প্রায় এইখানেই কাটোয়ার সুরুল পথের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। এই পথের ধারেই ছিল ছাতিমগাছ, সে গাছ এখনো আছে। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার প্রয়োজন।[৫]

প্রাপ্ত মহাজন সিদ্ধান্তগুলি থেকে বোঝা যায়—শান্তিনিকেতন বা ছাতিমগাছ আবিষ্কার ও মহর্ষির এখানে আগমন নিয়ে বিস্তর মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এঁরা রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু বলেন নি। শুধু মত ও পথ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেভাবে বা যে পথ দিয়েই হোক মহর্ষির যাত্রাপথে ছাতিমতলা এসে গেছে। তবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সর্বশেষ কিছু সিদ্ধান্ত না করেই বলেছেন—"এ সম্বন্ধে আরো গবেষণার প্রয়োজন।" এটিই প্রকৃত গবেষকের সিদ্ধান্ত বলে মনে করি।

আমরা জেনেছি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর বা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৫ই কার্তিক মহর্ষির সাধনক্ষেত্র ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমে প্রথম আচার্য হিসাবে নিযুক্ত হন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৩৩৫-৩৬ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বর্তমান গবেষকগণ প্রায়ই ভুলতে বসেছেন। এই সচেতন উপেক্ষাই 'গোড়ায় গলদ' সৃষ্টি করেছে। তিনি লিখেছেন—"তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি বোলপুরে বাস করিতাম। ভুবনডাঙ্গার ন্যায় ক্ষুদ্রপল্লীতে ডাকাইত দলের বাস ছিল শুনি নাই। গ্রামও বেশি দিনের নহে। নামেই তাহার পরিচয়। প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের দুর্বৃত্তলোকে পথিকদিগের প্রতি দস্যুতা করিত ইহা সম্ভবপর। জনশূন্য মাঠে ডাকাতি হয় না, রাহাজানি হয়। আর দ্বারিক সর্দার 'ডাকাতদলের সর্দার' রূপে ধরা দেয় নাই। চাকুরি করিতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাস করিয়াছিল। সুতরাং অজিতবাবুর উক্তি ভ্রমাত্মক।"[৬]

শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কথা অপরিহার্যরূপে এসে যাবেই। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ নাম দুটি প্রায় সমার্থক। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে আরম্ভের আরম্ভটা অনেক প্রাচীন পরম্পরার সূত্র ধরে এসে গেছে। এসব কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেকাংশেই অজানা। শান্তিনিকেতন কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁরা একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা বলবেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পুরাতন নথিপত্রে বলা হয়েছে 'মহর্ষির শান্তিনিকেতন'। কিন্তু এই অতি সরলীকৃত সিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের বিচারে যথেষ্ট নয়। ইতিহাসের তথ্য নিয়ে বিচার করলে রাঢ় বীরভূমের শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে অনেক অজানা ঘটনা আমরা জানতে পারি। আমাদের আলোচনা ইতিহাসের পাতায় শান্তিনিকেতন কেমন ছিল? কী ছিল সেই শান্তিনিকেতনে? তার রূপান্তরের ইতিবৃত্ত নিয়েই মহর্ষির শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

'ইতিহাসে শান্তিনিকেতন'

আজকের দিনে অনেকেই অবাক হবেন এই ভেবে যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এখানে

আসা ও শান্তিনিকেতনে ঈশ্বর দর্শন বা ব্রহ্ম উপলব্ধির সময়কাল থেকেই সব কিছু শুরু হয় নি—সূচনাটি অনেক প্রাচীন। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত করেছি মহর্ষিদেবের এখানে আসার আগেও 'শান্তিনিকেতন' ছিল। পাঠক যাই-ই ভাবুন বা বলুন না কেন আমরা বলবো ছিল। কারণ শান্তিনিকেতনের ইতিহাস একেবারে মাঝখান থেকে শুরু করেছেন মহাজনেরা। তাঁদের মতামত ও মতভেদ আমরা দেখেছি—এ যেন পথ হারানোর কথা। তবে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গ্রন্থে অনেক অজানা তথ্য দিয়েছেন—যা আজও উপেক্ষিতই থেকে গেছে। তাই একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শান্তিনিকেতনের ইতিহাস রচনায় বৃত্তের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা কম। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে ডাকাতদলের কাহিনী দিয়ে শুরু হয়েছে শান্তিনিকেতনের কথা। রবীন্দ্রপূজায় বিচারবোধ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। যাঁরা শান্তিনিকেতনের প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে খোঁজ খবর রাখেন, তাঁদের অনুরোধ দেখবেন প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাসে কি বিভ্রান্তি ঘটে গেছে এবং বর্তমান প্রজন্ম সেই ইতিহাসই বিশ্বাস করে।

আমরা বলতে চাইছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এখানে আসার আগেও এইস্থানে শান্তিনিকেতন ছিল—এ মতে ও সিদ্ধান্তে অনেকে বিস্মিত হবেন। বলবেন কেমন করে ছিল? শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তো তেমন কথা লেখা হয় নি। তাহলে মহর্ষির পূর্বে বোলপুর মৌজার অন্তর্গত ভুবননগরের বাঁধের উত্তরাংশে কেমন করে গড়ে উঠেছিল সে শান্তিনিকেতন? কে কখন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই শান্তিনিকেতনের? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে শুরুর ইতিহাস দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইছি।

পাট্টাপত্র (১২৬৯ বঙ্গাব্দ ১৮ ফাল্গুন) তিনটি

ইতিহাসের সন তারিখের মানদণ্ডে বিচার করলে কাগজে কলমে বা নথিপত্রে শান্তিনিকেতনের পত্তন হয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৮ ফাল্গুন বা ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে। কারণ ঐ তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও অন্যান্য ভাইদের কাছে কবুলতি দিয়ে কোম্পানির নিয়মে ৫.০০ (পাঁচ টাকা) জমায় "কুড়িবিঘার শান্তিনিকেতন" মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। প্রতাপনারায়ণ সিংহ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং

মহর্ষিদেবের অনুগত ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী শিষ্য। আমরা মহর্ষির গৃহীত পাট্টাপত্রটির অনুলিপি দিয়েই আলোচনা করছি।.

(মোহর — আট আনা)

[স্বাক্ষর]

True copy
Register No. 20
31st March 1863
and Registered by me the
same day between 10 & 11 a.m.
Sd/-

শ্রী প্রতাপনারায়ণ সিংহ শ্রী উদয়নারায়ণ সিংহ ও অছি নাবালকগণ শ্রী চন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও শ্রী তির্থনারায়ণ সিংহ তরফে. গগনচন্দ্র সিংহ শ্রী সূর্যনারায়ণ সিংহ শ্রী রসিকলাল সিংহ সবর্ব সাং রাইপুর চৌকী আমডহরা জেলা বীরভূম।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণেষু—

লিখিতং শ্রীপ্রতাপনারায়ণ সিংহ ও শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ স্বয়ং ও শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সিংহ ও নাবালক শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও শ্রীতির্থনারায়ণ সিংহ তরফ অলী শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ ও শ্রীরসীকলাল সিংহ কস্য মৌরসী পট্টকপত্র মিদং সন ১২৬৯ বারসও উনসত্তর সালাব্দে লিখনং কার্য্যানঞ্চাগে আমাদীগের জমিদারী জেলা বিরভোমের অন্তপাতি পরগণে সেনভূম তালুক শুপুর মদ্ধে হুদা বোলপুরের পত্তনির ডোল খারিজান মৌজে ভুবননগরের মধ্যে বান্দের উত্তরাংশে বি: নিচের চৌহদ্দী মোওাজী ২০ বিঘা জমি আপুনী বাগীচা আদী করিবার জন্য পট্টক লইতে ইচ্ছা করায় আমরা সকলে এক ঐক্য হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত ২০/কুড়ি বিঘা জমির সালিআনা কোম্পানী ৫৲ পাঁচ টাকা জমায় আপনকাকে বাগ বাগীচা ও এমারত ও পুষ্কর্ণি আদী করিবার জন্য মৌরসী পাট্টা দিয়া লিখিয়া দিতেছি জে আপুনী উক্ত জমিতে বাগ বাগীচা ও এমারত ও পুষ্কর্ণি আদী প্রস্তুত করিয়া দান বিক্রয়ের সত্তাধিকারিওরূপে পুত্রপৌত্রাদীক্রমে ভোগদখল করিতে রহেন। সন সন কিস্তিবন্দী যুরত মালগুজারির সরবরাহ করিবেন কিস্তি খেলাপ কারণ ফি সতে দরমাহা ১৲ এক টাকা হিসাবে সুদ দিবেন মালগুজারি আদাএর তুটী কারণ মাফিক আইন আমলে আসীবেন উক্ত জমার উপর কখন কমী বেসী হইবেক না হাজাযুকা কোন দফার উজর না করিয়া অবধারিত মালগুজারির সরবরাহ করিবেন এতদর্থে কবুলতি লইয়া মৌরূসী পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি ১২৬৯ সাল বারসও উনসত্তএ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন—

তপসীল চৌহদ্দী	ইসাদি	
বান্দের উত্তরাংশে সান্তীনীকেতন	শ্রীরামধন ঘোষ	শ্রীশ্রীনাথ সীংহ
বান্দের উত্তরাংশে সান্তীনীকেতননামা	সাং রাইপুর	সাং রাইপুর
গৃহের চতুষ্পার্শের মধ্যে ২০/বিঘা।	শ্রীরামেশ্বর লাহিড়ি	শ্রীহরিচরণ পরামানিক
	সাং সান্তীপুর	সাং রাইপুর
	মোং রাইপুর	
	শ্রীরাধামোহন মিত্র	শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ
	সাং মহুরাপুর	সাং রাইপুর
	মোং রাইপুর	

৩৭৪ নং

সন ১৮৬৩/২৮ ফিবরওয়ারি শ্রীনিত্যানন্দ পাল ইষ্টাম্প কোরস মোং রাইপুর জেলা বিরভোম। খরিদার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ সাং রাইপুর দাম ॥০ আনা।

৫৮৯ নং
সন ১৮৬৬/৭ জুন
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস মোকাম কালেকটরি
জেলা বীরভূম

খরিদা
শ্রীকীসোরিনাথ চাটুজ্যা
॥০ আট আনা

৬০০ নং

সন ১৮৬৬/৭ জুন	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস	খরিদ্দার
মোং কালেকটরি	মোকাম বিরভূম	কিসোরিনাথ চাটুজ্যা
		॥০ আট আনা

এই নকল প্রস্তুত হওার পর শ্রীকীসোরিনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হাওালা করা যায় ইতি সন ১২৭৩ সাল তারিখ ২৭ জ্যৈষ্ঠ কীতা (?) ৸০ মাসুল বার আনা।

No. new 8.[৭]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহীত পাট্টাপত্রটিকে লক্ষ্য করলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পেতে পারি।

(১) ৩৭৪ নং কোম্পানির আট আনা স্ট্যাম্প কাগজটি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি কেনা হয়েছিল। ক্রেতা ছিলেন রাইপুর গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ দাম ॥০ আট আনা।

(২) জমিদারি সেরেস্তায় কবুলতি দিয়ে সাধারণ কাগজে পাট্টা গ্রহণ করার পর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ পাট্টাপত্রটি কোম্পানির অনুমোদন পায়। (ডিড) রেজিস্টার মহাশয় বেলা ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে এটি স্বাক্ষর করেন এবং জেলার জজ মহাশয়ও এতে স্বাক্ষর করেন। এ ছাড়া বর্তমানে সংরক্ষিত পাট্টাপত্রটি True copy বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) ডিড রেজিস্টার পাট্টাপত্রের তিনটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছেন।

(৪) পাট্টার নকলের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ৫৮৯ নং-এ লেখা আছে মোকাম কালেকটরের গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম। এটি ১৮৬৬ সালের ৭ জুন বলে উল্লেখ আছে।

এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল মহর্ষিদেবের আপুজন 'কিশোরিনাথ চাটুজ্যা' এটি ॥০ আট আনায় ক্রয় করেন।

(৫) পাট্টার নকলের ৬০০ নং-এ পঞ্চম পৃষ্ঠায় ঐ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন কাগজ ক্রয় করেন কিশোরিনাথ চাটুজ্যা, দাম ॥০ আনা, মোকাম কালেকটরি জেলা বীরভূমের গোবিন্দচন্দ্র দাসের নিকট। এই নকল প্রস্তুতের পর মহর্ষির বিশ্বস্ত "কিশোরিনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হাওলা করা" হয়েছে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে।

(৬) দলিলে বা পাট্টাপত্রের সাক্ষী বা ইসাদী হিসাবে রায়পুরের অনেকের সঙ্গে সাকিম মহুরাপুরের রাধামোহন মিত্র এবং সাকিম শান্তিপুরের রামেশ্বর লাহিড়ীর নাম পাওয়া গেছে।

(৭) মূল পাট্টাপত্রটি আর পাঁচটি পাট্টাপত্রের রচনাশৈলীতে লেখা নয়। জমিদারির পাট্টাপত্রের নিয়মাবলি লেখা থাকলেও পাট্টাপত্রটি শুরু হয়েছে—"শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু" সম্বোধন করেই। এটি অভিনব, কারণ মহর্ষির ব্রাহ্মশিষ্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ গুরুদেবকে

বন্দনা করে শ্রদ্ধার সঙ্গেই কোম্পানির নিয়মে 'শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতন গৃহ সমেত বিশ বিঘার' স্থানটি পাট্টা প্রদান করেন।

(৮) পাট্টাপত্রে লেখা হয়েছে "বান্দের উত্তরাংশে বি: (বর্ণিত) নিচের চৌহদ্দী মোওাজী ২০/বিঘা জমি"—অর্থাৎ বর্ণিত নীচের চৌহদ্দীতে যা লেখা হয়েছে সেইটুকু জমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। মোওাজী শব্দের অর্থ সর্বসমেত।

(৯) জমিটি পাট্টা নিতে ইচ্ছা করায় কোম্পানির নিয়মে বিঘা প্রতি ।০ চার আনা হিসাবে কোম্পানির নিয়মে মোট পাঁচ টাকায় মহর্ষিকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল—দান হিসাবে দেওয়াও হয়নি এবং মহর্ষিদেব দান গ্রহণও করেন নি। আইন মাফিক শর্তসাপেক্ষে কবুলতি দিয়েই 'কুড়িবিঘার শান্তিনিকেতন' তিনি গ্রহণ করেন।

(১০) তপশীল চৌহদ্দীতে লেখা আছে "তপশীল চৌহদ্দী—বান্দের উত্তরাংশে সান্তীনীকেতন বান্দের উত্তরাংশে সান্তীনিকেতননামা গৃহের চতুরপার্শের মধ্যে ২০/বিঘা"।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহীত পাট্টাপত্রের অবিকল নকলটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে বাঁন্দের উত্তরাংশে "শান্তিনিকেতননামাগৃহ সমেত শান্তিনিকেতন" তিনি শিষ্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়দের নিকট পাট্টা গ্রহণ করেন। সন তারিখের হিসাবে বিচার করলে বলতে দ্বিধা নেই যে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন বা ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চের আগেই এখানে বাঁধের উত্তরদিকে শান্তিনিকেতনগৃহ সমেত ২০ বিঘার শান্তিনিকেতন ছিল। অতএব দলিলের বা পাট্টার প্রমাণ হিসাবে ঐ তারিখের আগেই অর্থাৎ ১৭ই ফাল্গুনের আগেও শান্তিনিকেতনের অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁর মালিক রায়পুরের সিংহ পরিবার। আর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের আগে যে "বিশবিঘার শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনগৃহ" ছিল সেটি আকারে এত বড় না হলেও গৃহটি ছিল—এ বিষয়ে আর সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তবে কেমন ছিল সে গৃহ এবং শান্তিনিকেতন, সে বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করবো।

পাট্টাপত্রের দাতা হলেন মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মের শিষ্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ। পাট্টার কোম্পানির কাগজের (ইস্টাম্প কাগজ) মূল অংশের ক্রেতা রায়পুরের লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ। মূল পাট্টাপত্রের সঙ্গে ৫৮৯ নম্বরের স্ট্যাম্প কাগজটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুনের ক্রেতা ছিলেন মহর্ষির আপ্ত সহায়ক শ্রীকিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া ঐ তারিখের ৬০০ নম্বরের স্ট্যাম্প কাগজটিও কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায় বার আনায় ক্রয় করেন। এরপর নকল প্রস্তুত হলে সব কিছু ঐ তারিখে কিশোরী চট্টোপাধ্যায়কে হাওলা দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ 'বিশ বিঘার শান্তিনিকেতন' হস্তান্তরের সঙ্গে মহর্ষির বিশ্বস্তজন কিশোরী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদ্যান্ত যুক্ত ছিলেন।

পাট্টার 'ইসাদী'—অর্থাৎ সাক্ষীরূপে রায়পুরের অনেকের সঙ্গে সাকিম মহুরাপুরের রাধামোহন মিত্র মহাশয় স্বাক্ষর করেছেন এবং সাকিম শান্তিপুরের রামেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ও সাক্ষী হিসাবে থেকেছেন। এঁরা দুজনে মোকাম অর্থাৎ অস্থায়ী ঠিকানা রায়পুরে থাকতেন। কারণ জানা না গেলেও এঁরা এই মহৎকর্মে যুক্ত থেকেছেন। আমরা এঁদের বিষয়ে আলোচনা করবো প্রসঙ্গান্তরে।

ভুবনসাগর বা ভুবনডাঙ্গার বাঁধ

পাট্টাপত্রের তপশীল চৌহদ্দীতে লেখা আছে "বাঁধের উত্তরাংশে শান্তিনিকেতন"—তাহলে বাঁধটি খননের সন তারিখ নিয়ে আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে। 'ভুবনসাগর' বা 'ভুবনডাঙ্গার বাঁধটির' খননের পাথুরে প্রমাণ রয়েছে বাঁধের দক্ষিণ ধারে খোদিত একটি ফলকে। এতে লেখা আছে—"ভুবনসাগর ১২৩৩ বঙ্গাব্দে নিখাত। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে দুর্বৎসরে ভুবনডাঙ্গা সমবায় সমিতি দ্বারা পুনঃ

সংস্কৃত।"[৮] অর্থাৎ ১৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে বাঁধটি খনন করা হয়। সেজন্য মহর্ষিদেবকে শান্তিনিকেতন পাট্টা দেবার সময় বাঁধটির উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় চৌহদ্দী উল্লেখ করেই জমি জায়গা দান বিক্রয় করা হত। তাই ভুবনডাঙ্গার বাঁধের উল্লেখ আমরা পেয়েছি।

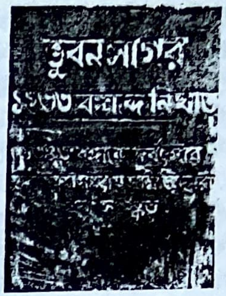

ভুবনসাগর বা ভুবনডাঙ্গার বাঁধ

যতটুকু জানা যায় ভুবনডাঙ্গা গ্রামটি বোলপুর মৌজার অধীন। রায়পুরের জমিদারদের প্রজা বসতি ও তাদের প্রয়োজনেই বাঁধটি খনন করা হয়েছিল। সেদিক থেকে গ্রামের পত্তন ১৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দের সময়েই হয়েছিল। এমনও হতে পারে ভুবনমোহন সিংহের স্মৃতি রক্ষার্থেই 'ভুবননগর' ও 'ভুবনসায়র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। তবে ভুবনবাবু যে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের আগেই দেহ রেখেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। নইলে মহর্ষিদেবের পাট্টাগ্রহণের সময় বেঁচে থাকলে এই পুণ্যকর্মে তিনিই পাট্টাপত্রে স্বাক্ষর করতেন। সেজন্য একথা বলা যায় যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে রায়পুরে আসার আমন্ত্রণ জানানো ও 'শান্তিনিকেতন' পাট্টা দেওয়ার পিছনে ভুবনবাবুর প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা ছিল না। তাঁর পরলোক গমনের পরই এসব ঘটনা ঘটেছে।

ছাতিমতলা

'ছাতিমতলা' হল শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'মূলাধার'। এ প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্র অনেকদূর প্রসারিত। তবে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা দিয়েই ছাতিমতলা প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনিরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতদলের নায়ক।...এই সর্দার সেই ডাকাতি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করিনে। আশ্রমের সম্পর্কে কোন রক্তচক্ষু তিলকলাঞ্ছিত ভদ্রবংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংস প্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।"[৯]

শান্তিনিকেতনের প্রাচীন ছাতিমতলা

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ডাকাত সর্দার ও এক বামাচারী তান্ত্রিকের কথা উল্লেখ করেছেন যা শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল উৎস। আর এসব কথা রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষিদেবের এখানে আসার আগেকার ঘটনা। অতএব মহর্ষির সাধনক্ষেত্রের ইতিবৃত্তটি বীরভূমের পরম্পরাগত তান্ত্রিক ও শক্তিসাধকের স্থান হিসাবেই সাধারণ মানুষ জানতেন। ছাতিমতলা ছিল সেই ভদ্রবংশীয় শক্তিসাধকের সিদ্ধাসন। ডাকাতির কাহিনী ইত্যাদি ঘটনা দিয়ে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে বীরভূমের সাধন পরম্পরাকে অনেকেই স্বীকার করেন নি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের প্রসঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি লিখে গেছেন।

'শান্তিনিকেতন আশ্রম' গ্রন্থের রচয়িতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অন্যতম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পিছনে যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি তাঁর মামা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওষুধের কারবারে যোগ দিতে বোলপুরে আসেন। সে সময়েই পরিত্যক্ত মহর্ষির সাধনক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর বা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে তিনিই প্রথম 'আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। অতএব অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ গ্রন্থটির গুরুত্ব যথেষ্ট। তিনি এই আশ্রমের 'আশ্রমধারী' হিসাবে যা লিখে গেছেন তা হল—"মহর্ষির মুখে শুনিয়াছি বেদি প্রস্তুতের জন্য এই স্থান খনন করিবার সময় অনেক নরমুণ্ডাস্থি পাওয়া গিয়েছিল।"[১০] ছাতিমতলায় নরমুণ্ড প্রোথিত থাকায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"ছাতিম গাছ দুটির কাছে কেবল করোটি প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু কঙ্কালের অন্য কোন অংশ পাওয়া যায় নাই। ছাতিম গাছ এ অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায় না, বস্তুত দুষ্প্রাপ্য। বীরভূম জেলায় বৈষ্ণব সাধনার জন্য খ্যাত বহুস্থান থাকলেও এ অঞ্চল তান্ত্রিক সাধনার জন্যে বিশেষভাবে পরিচিত। আশ্রম হতে কএক মাইলের মধ্যে কঙ্কালীতলা তান্ত্রিকদের একটি কেন্দ্র। আরও কয়েক মাইল দূরে লাভপুরে এইরূপ আর একটি কেন্দ্র আছে। এই সমস্ত বিবেচনা করলে মনে হয় তান্ত্রিকেরাই ছাতিমগাছ এনেছিল এবং করোটি এনে নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী আসন রচনা করেছিল। এখানকার করোটিগুলির সঙ্গে ডাকাতি কি রাহাজানির কোন সম্পর্ক নাই। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে মহর্ষিদেব এই বীরভূম জেলার মধ্যেই এখানে একটি তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে নিরাকার এক ব্রহ্মের সাধনা করেছিলেন এবং অনুরূপ সাধনার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

ছাতিমতলার আসনটি ইঁট, চুন, বালি দিয়ে অনতি উচ্চাকার আসনের উপর মার্বেল পাথর বসানো হয়। রঙ্গিন বাথ টাইল দিয়ে বেদীর চারপাশ সাজানো হয়।

তিনি আরও লিখেছেন—"আগেই বলেছি বেদিটিকে আর দেখি না। এই বেদিটির সঙ্গে আমার জীবনের একটি পরম শুভ মুহূর্ত বিজড়িত থাকায় প্রায়ই এর কথা মনে পড়ে, এবং কখনো কখনো মন বিশ্বাসই করতে চায় না যে সেটি আর নেই। কখনো কখনো বোধ হয় যে উঁচু করে মাটি দেওয়া হয়েছে তা তফাৎ করে দিলেই বেদিটি বুঝি দেখতে পাব।"[১১]

ছাতিমতলার বেদিটি প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন—"১২৮৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহর্ষির সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর লেখা মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্টেই অনুমান হয় ১২৮৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের আগেই বেদি নির্মিত হয়।"[১২] তাহলে ছাতিমতলায় বর্তমানে যে বেদিটি এখন দেখা যায় সেটিই মূল বেদি নয়। মহর্ষির সিদ্ধাসনের মূল বেদিটি প্রত্নবস্তুরূপে মাটির নীচে রয়ে গেছে। তবে একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যদি ছাতিমতলায় ডাকাতি হত বা ডাকাতদের হাতে নিহত মানুষের নরকঙ্কাল সেখানে প্রোথিত থাকত তাহলে স্থানটির গুরুত্ব তেমন থাকত না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু সাধনার উচ্চকোটিতে অবস্থান করছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই স্থানটির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যকরূপে অভিহিত ছিলেন। তাই বীরভূমের বীরাচারী তান্ত্রিকদের সিদ্ধাসনটি তাঁর সাধনপথে কোনো অন্তরায় হয়ে ওঠে নি। সর্বোপরি তান্ত্রিকের সিদ্ধাসনে প্রোথিত নরকরোটিগুলিকে রেখেই সিদ্ধাসনটি পাকা করে বেদি নির্মাণ করান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহানির্বাণতন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। নিজে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধক হলেও ব্রাহ্মসমাজের সাধনশৈলীতে মহানির্বাণতন্ত্রের প্রচুর মন্ত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষির আত্মজীবনীতে সেগুলি দেখতে পাই আমরা। সর্বোপরি এ কথা অস্বীকার করার উপায়

নাই যে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা বীরভূমের পরম্পরাবাহী শক্তিসাধকের স্থান হিসাবে স্থানীয় মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। সেজন্য মহর্ষিদেব দৈবনির্দেশে এখানে সাধনার আসন পেতে ঈশ্বরলাভ করলে তাতে গৌরবের হানি হয় নি। কারণ ভারতীয় সব সাধনাতেই সাধকের সিদ্ধিলাভের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট আসন থাকে। সেখানেই তাঁর চরমপ্রাপ্তি ঘটে। সেদিক থেকে আমরা অনেক দৃষ্টান্তই দেখতে পাই। যেমন বীরভূমের সাধক বামাক্ষেপা বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসনে সিদ্ধিলাভ করায় তারাপীঠের খ্যাতি বিশ্বময় হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধিলাভের পর দক্ষিণেশ্বরের খ্যাতি জগৎজোড়া—তেমনি শান্তিনিকেতনের এক অজ্ঞাত তন্ত্রসাধকের সিদ্ধাসনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সিদ্ধিলাভ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো ঋষি কবির আবির্ভাবে শান্তিনিকেতন বিশ্বখ্যাত হয়েছে। এরজন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বা রবীন্দ্রনাথের গৌরবের কোন হানি হয় নি। এক কথায় বলা যায় মহর্ষির এখানে আসা, ছাতিমতলার পূর্ব নির্দিষ্ট সিদ্ধাসনে সিদ্ধিলাভ, এসব স্বীকার করলে বীরভূমের সাধনপরম্পরা ও ইতিহাসকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়।

শান্তিনিকেতনে সিদ্ধাসনের ছাতিমগাছ দুটি ছিল মহর্ষির 'বোধিবৃক্ষ'। এখান থেকে তিনি চলে গেলেও প্রয়াণকালে তিনি তাঁর বোধিবৃক্ষ বা ছাতিমগাছের চারা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি ছাতিমগাছ দেখেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছাতিমগাছ বা সপ্তপর্ণবৃক্ষকে দেববৃক্ষ বা শক্তিপর্ণ বলা হয়েছে। যতটুকু জানা যায় তন্ত্রসাধকেরা দক্ষিণভারত থেকে এখানে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ নিয়ে আসেন। শব্দার্থে সপ্তপর্ণ পুংলিঙ্গে নানা অভিধায় পরিচিত। যেমন বিশালত্বক, শারদ বা শারদী, বিষমচ্ছদ, দেববৃক্ষ, দানগন্ধী, শিরোরুজা, গ্রহনাশ, শ্রুতিপূর্ণ, গৃহাশী, গুপ্তপুষ্প, শক্তিপর্ণ, সুপর্ণক, বৃহত্বক, সপ্তচ্ছদ, ভদ্রগন্ধ ও গন্ধীপর্ণ।

সপ্তপর্ণের ভেষজ গুণ হল— ব্রণ, শ্লেষ্মা, বাত, কুষ্ঠ আমাশয় ও ক্রিমিনাশক। এর স্বাদ তিক্ত ও উষ্ণ। এ গাছ শ্বাস উদ্দীপিত করে। তবে গুল্মজনিত পীড়ানাশ করে। কালিদাসের রঘুবংশের ৫/৪৮ (পঞ্চম সর্গের আটচল্লিশ) শ্লোকে সপ্তপর্ণের উল্লেখ আছে।[১৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে যে কয়টি 'দেববৃক্ষ বা শক্তিবৃক্ষ বা কৌলবৃক্ষ' আছে তার মধ্যে সপ্তপর্ণ বা ছাতিমবৃক্ষ অন্যতম। শক্তিসাধকগণ সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে পঞ্চ, নবমুণ্ড প্রভৃতি শৈলীর আসন রচনা করে সাধনা করতেন। শান্তিনিকেতনেও বীরাচারী তান্ত্রিকের অনুরূপ সিদ্ধাসন ছিল। আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষও ছাতিমগাছকে দেববৃক্ষ হিসাবে পূজা করে থাকেন।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্নাতকদের শংসাপত্রের সঙ্গে ছাতিম পাতা দানের প্রথা পালিত হয়। দীক্ষান্ত ভাষণের পর আচার্য স্নাতকদের মহর্ষির বোধিবৃক্ষের পাতা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বভারতীর স্বতন্ত্র রীতির প্রসঙ্গে খুব কমই অবহিত আছেন। যদিও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে সমধিক পরিচিত—কিন্তু বিশ্বভারতীর আত্মাটি হল ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির সূত্রে গাঁথা বলেই এখানকার সমাবর্তন অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র শৈলীতে পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন সপ্তপর্ণের সাতটি পাতার মতো ব্রহ্মচারী স্নাতকদের মধ্যে যেন প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ হয়। বিদ্যালাভের মধ্যে দিয়ে বোধির বা চৈতন্যশক্তির উন্মেষ হোক। শিক্ষা শুধু অর্থ দিতে পারে—কিন্তু বিদ্যা মানুষের পূর্ণতা নিয়ে আসে। সর্বোপরি সূর্যের সাতটি রঙের অনুরূপ সপ্তপর্ণের সাতটি পাতার মতো ছাত্রদের সার্বিক বিকাশ কামনাই সমাবর্তনের মূল ভাবনা। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে" ঋষিবাক্যের সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্র হল শান্তিনিকেতন—এর মূলাধার সপ্তপর্ণের 'বোধিবৃক্ষ'।

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বৌদ্ধভিক্ষুদের বোধিবৃক্ষের পাতা প্রদানের রীতি ছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলায় বোধির জাগরণের জন্য শংসাপত্র অপেক্ষা বোধিবৃক্ষের গুরুত্ব ছিল বেশি।

বলা বাহুল্য শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যেমন মহর্ষির বোধিবৃক্ষের প্রতীক হিসাবে সপ্তপর্ণ প্রদানের রীতি চলে আসছে—তেমনি এখানে 'দেশিকোত্তম উপাধি' প্রদানের মধ্যে প্রাচীন গুরুকুলের সম্মান প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুলের পণ্ডিতদের আচার্য ও দেশিক বলা হয়েছে। 'দেশিক' শব্দের অর্থ হল--যিনি 'দে' দেবরূপধারী, 'শি'-শিষ্যের কল্যাণকারী ও 'ক'-করুণাময়। এমন গুণবিশিষ্ট আচার্য্যই 'দেশিক' হিসাবে খ্যাত ছিলেন।[১৪] ফলে 'দেশিককুলের' যিনি উত্তম তাঁকেই 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদানের রীতি এখানে প্রবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন তপোবনের শিক্ষা আদর্শেই বিশ্বভারতীতে এমন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে বলে মনে করি। সপ্তপর্ণ ও 'দেশিকোত্তম' উপাধিদান রীতি বিশ্বভারতীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবেই খ্যাত।

শান্তিনিকেতনগৃহ

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে 'শান্তিনিকেতনগৃহ' একটি ঐতিহাসিক ইমারত। এখানকার ইতিহাস রচনা করতে গেলে 'গৃহটি'র প্রসঙ্গে আলোচনা অপরিহার্য। পূর্বাপর আলোচনায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে

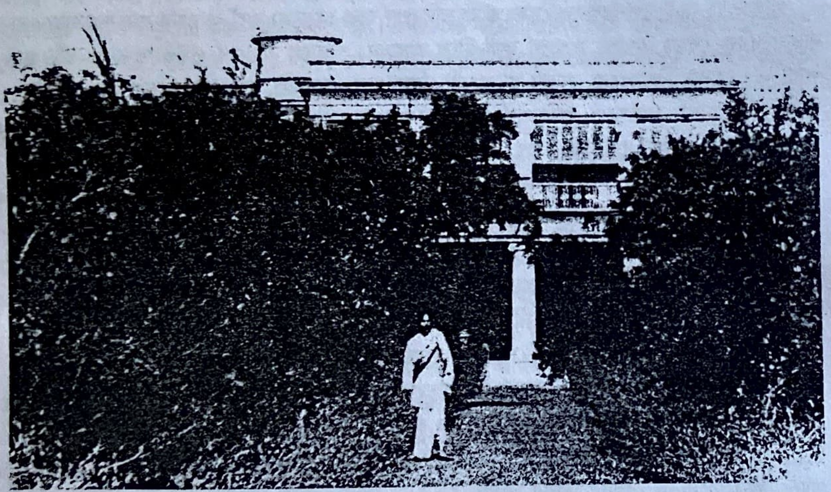

শান্তিনিকেতনগৃহ ও রবীন্দ্রনাথ

মহর্ষি এখানে ছাতিমতলায় আত্মার শান্তি লাভ করার জন্যই জায়গাটির নাম রাখেন শান্তিনিকেতন; এবং গৃহটি নির্মাণ করিয়ে নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতনগৃহ'। এ মত অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং সাধারণ মানুষও তাই জানেন। কিন্তু সন তারিখ দলিল পত্রাদি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলিতে আর আস্থা থাকে না। বলা বাহুল্য কাগজে কলমে শান্তিনিকেতনের ইতিহাস শুরু হয়েছে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন বা ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২-৩ মার্চে গৃহীত মহর্ষির পাট্টাপত্র থেকে।

পাট্টার তপশীল মাফিক আমরা বলতে পারি ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন মহর্ষিদেব শিষ্য প্রতাপনারায়ণের কাছে শান্তিনিকেতন স্থান ও শান্তিনিকেতনগৃহ সমেত ২০ বিঘা জমি পাট্টা নিয়েছিলেন। অতএব মহর্ষিদেবই যে স্থানটির নামকরণ ও গৃহটি প্রথম তৈরি করেছিলেন তা আর বলা যাবে

না। তাহলে ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাল্গুনের আগেই অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২-৩ মার্চের আগেই বাড়িটি ছিল। তবে আকারে এত বড় না হলেও ছিল। পরে ঐ ক্ষুদ্র আশ্রয়টি মহর্ষিদেব সংস্কার করিয়েছিলেন।

এখানে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রাণপুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনভূমিতে 'আশ্রম' ও 'উপাসনাগৃহ' বা 'মন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মাধ্যমে। তিনি দিন-ক্ষণ ইত্যাদি শুভসময় বিচার করিয়েই শান্তিনিকেতনে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্তিক বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করান। এরপর ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ বা ১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর মন্দির প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল শান্তিনিকেতনের মতো উষর লালমাটির প্রান্তরে তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামকরণ ও 'শান্তিনিকেতনগৃহ' নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন কিছুই করলেন না। এমন কি মহর্ষির জমিদারীর হিসাবের খাতাতে তেমন কোনো ঘটনার কথাও লেখা হল না।

তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিসাবের খাতা ইত্যাদি অনুসন্ধান করে শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ গবেষক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয় লিখেছেন—"অন্যূন দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে উক্ত গৃহের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ চলেছিল ১৮৭৭ সাল অবধি। মহর্ষির নিজ হিসাবের খাতাপত্রে "শান্তিনিকেতন তইয়ারির খাতে" ১৮৭৭ সালের ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত খরচ হয়েছিল ১৩০১৫ টাকা ৪ আনা ৬ পাই। এবং ১৮৮৪ সালের ১৫ই নভেম্বরের ঐ খাতে খরচ ধরা হয়েছে ৬৮২ টাকা।"[১৫]

মহর্ষির হিসাবের খাতায় আরও একটি তথ্য পাওয়া গেছে। "১২৭১ বঙ্গাব্দের ৯ বৈশাখ ইং ২১শে এপ্রিল ১৮৬৪ বোলপুরের হিসাবে চুন ও বরগা ও রং খড়ির বাবদ ১৩৮ টাকা আট আনা তিন পাই এবং ১লা অগ্রহায়ণ ১২৭১ ইং ১৫ নভেম্বর ১৮৬৪ শান্তিনিকেতন খাতে জনৈক রফিমদ্দি মিস্ত্রীকে শান্তিনিকেতনের গাথনির হিসাব শোধ করা হয় ১৬ টাকা পাঁচ আনা।"[১৬]—তাহলে দেখা যাচ্ছে 'শান্তিনিকেতন' পাট্টাগ্রহণের বৎসরাধিক পরে থেকে 'কুড়ি বিঘার শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনগৃহ' সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

'শান্তিনিকেতনগৃহ' সম্পর্কে আর একটি তথ্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন দলিলে ভুবনডাঙ্গার বাঁধের উল্লেখ করেই পাট্টা দেওয়া হয়েছে। আর বাঁধ খননের তারিখ আমরা পেয়েছি ১২৩৩ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দ। ভুবননগর গ্রামটিও প্রায় সমকালে পত্তন হয়। অতএব প্রাথমিকভাবে মনে করা যেতে পারে শান্তিনিকেতনগৃহটি ১২৩৩ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ কালে নির্মিত হতে পারে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা হলে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

মহর্ষির হিসাবের খাতায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জনৈক রফিমদ্দি মিস্ত্রীর নাম পাওয়া গেলেও এর বেশি কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু শান্তিনিকেতন গড়ার যুগে অনেক নাম না-জানা মিস্ত্রী কর্মী যাঁরা কাজ করে গেছেন তাঁদের পরিচয় আজ হারিয়ে গেছে। তবে বোলপুর শহরের ইতিবৃত্তে 'মিস্ত্রীপাড়া' নামে একটি বসতি আছে। এই 'মিস্ত্রীপাড়ার' মানুষেরা মূলত বিহার প্রদেশের মুঙ্গের অঞ্চলের বাসিন্দা। মুঙ্গেরের ইতিহাসে কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। যেমন ভূমিকম্প, প্লেগের মহামারি ও ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ ও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের ঘটনা। বোলপুরের মিস্ত্রীপাড়ার বাসিন্দারা ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই অজানা উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলায় চলে আসেন। এঁদের অনেকে কলকাতায় চলে যান—আবার কয়েকটি পরিবার বোলপুরে চলে আসেন।

বোলপুরে যাঁরা থেকে যান তাঁদের মধ্যে 'টেক্কা মিস্ত্রী' নামে একজন দক্ষ রাজমিস্ত্রীর পরিবার এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। টেক্কা মিস্ত্রীর পরিবার বর্তমানে বোলপুর হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। টেক্কা মিস্ত্রীর পিতৃদত্ত নামটি জানা যায় না—তবে রাজমিস্ত্রীকর্মে তাঁর দক্ষতায় সাধারণ মানুষ তাঁকে 'টেক্কা মিস্ত্রী' বলত। টেক্কা—অর্থাৎ সবার শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠতম। টেক্কা মিস্ত্রীর পরিবারকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য রায়পুরের সিংহ পরিবার তাঁদের জমিদারি বোলপুর মৌজায় জায়গা পাট্টা দেন। সেই জায়গাতেই টেক্কা মিস্ত্রীর পরিবার বর্তমানে বাস করছেন।

টেক্কা মিস্ত্রীর কর্মদক্ষতা ও সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের নৈপুণ্যে তিনি স্থানীয় জমিদার ও অভিজাত পরিবারের ইমারত আদি নির্মাণ করতেন। টেক্কা মিস্ত্রীর পুত্র ঈশ্বর মিস্ত্রী ও তাঁর সন্তান মতিলাল মিস্ত্রীও পিতার কর্মে যুক্ত থেকে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের পরিবারের সূত্রে জানা যায় টেক্কা মিস্ত্রী থেকে মতিলাল মিস্ত্রী পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরে শান্তিনিকেতন গড়ার যুগে ইমারত আদি নির্মাণে কাজ করে গেছেন। এঁদের পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায় শান্তিনিকেতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ কর্মেও এঁরা যুক্ত ছিলেন বলে শুনে আসছেন। বর্তমান 'উদয়ন গৃহটি' নির্মাণকালে টেক্কা মিস্ত্রীর পুত্র ঈশ্বর মিস্ত্রী দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন।[১৭]

টেক্কা মিস্ত্রীর বংশধরদের বর্তমান পদবি হল দাস। বর্তমানে মিস্ত্রী পরিবারের মতিলাল মিস্ত্রীর দুই সন্তান। এঁরা হলেন বীরেন্দ্রনাথ ও ঘনশ্যাম। বীরেন্দ্রনাথ দাস বিশ্বভারতীর প্রাক্তন কর্মী। তিনি এঁদের পরিবারের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে প্রাচীন যোগসূত্রের কথা শুনেছেন। 'স্মৃতির শান্তিনিকেতন'-এ এমন কথা জানা গেছে। আবার শান্তিনিকেতন গড়ার যুগে অনেক ব্যক্তি ও পরিবার অপরিচিতির অন্ধকারে থেকে গেছেন। এইসব পরিবারের কথা ও তথ্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান চালালে শান্তিনিকেতনগৃহ ও মহর্ষির শান্তিনিকেতনের অনেক অজানা কথা জানা যাবে।

দ্বারিক সর্দার

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তখন শান্তিনিকেতনে একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতদলের নায়ক। ...এই সর্দার সেই ডাকাতি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত।"[১৮] রবীন্দ্রনাথের লেখা এই রোমান্টিক কাহিনীরসই ইতিহাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মহর্ষির জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী। তাঁর সিদ্ধান্ত আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এর পরেও অনেকে এই ছাতিমতলা প্রসঙ্গে ডাকাত দলের কাহিনীর দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিন্তু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারিকসর্দার সম্পর্কে এসব ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই বোলপুরে চলে আসেন। এরপর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯ অক্টোবর থেকে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমে আচার্য হিসাবে থেকেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্যাদি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখেছেন—"মহর্ষির অবস্থিতিকালে শান্তিনিকেতনে একবার ডাকাতি হয়। এজন্য তিনি দস্যুদলের অবস্থাভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত দারোয়ান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। শুনিয়াছি মানকরের জমিদারবাবু হিতলাল মিশ্র একজন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ লাঠিয়ালকে মহর্ষির নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহার নাম 'দ্বারিক সর্দার'। দ্বারিক সর্দার এই কর্মসূত্রে মানকর হইতে আসিয়া ভুবনডাঙ্গায় বাসস্থাপন করেন। ...১২৯৫ সালে আমি যখন সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলাম তখন দ্বারিক সর্দার আশ্রমের পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকিত। তাহার বিশ্বস্ততায় নির্ভর করিয়া আমরা নির্ভয়ে বাস করিতাম।"[১৯]

অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—"অনুসন্ধানে জানা যায় যে দ্বারিক

সর্দার পূর্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের লোক ছিল। মানকরের জমিদার বাড়িতে সর্দারের কাজ করত। কয়েকবার সর্দার আমাকে বর্ধমান জেলায় আমাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছে। সেই সময় বর্ধমান শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি দেখেছি। এ পরিবারের কেউ ডাকাত ছিল এরূপ শোনা যায় না।"[২০]

দ্বারিক সর্দার ডাকাতদলের সর্দার হিসাবে এখানে আসে নি একথা প্রমাণিত। তাঁকে প্রহরী হিসাবেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর ছেলে সুচাঁদ শান্তিনিকেতনগৃহটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বারিক সর্দারের বংশধরগণ এখন ভুবনডাঙ্গা গ্রামে বাস করেন।

শান্তিনিকেতনের সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল দ্বারিক সর্দারের উপর। দ্বারিকের থাকার জন্য বর্তমান 'দেহলীবাড়ির' (বর্তমান মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা) দক্ষিণদিকে এবং মৃণালিনী ছাত্রীনিবাসের প্রাঙ্গণে একটি বাড়ি নির্মিত হয়। এটি 'দ্বারিকবাড়ি' নামে পরিচিত। পরে দ্বারিকবাড়িটি সম্প্রসারণ করে দোতলা করা হয়। সাবেকী শান্তিনিকেতনে কর্মীদের বসবাসের জন্য এটি ব্যবহৃত হতে থাকে। স্মৃতির শান্তিনিকেতনের পাতায় সে-বাড়ির পরম্পরা বিশ্বভারতীর কর্মীদের মধ্যে রয়ে গেছে। এমনই একটি ঘটনা হল—পারুলডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রভাকর মণ্ডল এই 'দ্বারিকবাড়িতে' সপরিবারে বাস করতেন। এই বাড়িতেই থাকাকালীন তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়—সময়টি ছিল ১৯৫৬ সাল। দ্বারিকবাড়িতে জন্ম হয় বলে তৎকালীন অধ্যক্ষ অনিলকুমার চন্দ মহাশয় প্রভাকর মণ্ডলের ছেলের নামকরণ করেছিলেন 'দ্বারিক'। প্রভাকর মণ্ডল মহাশয় শিক্ষাভবনের কর্মী ছিলেন। তিনি গ্রামে চলে গেলে পরে বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। ভুবনডাঙ্গায় দ্বারিক সর্দারের পরিবারের সঙ্গে সেকালের শান্তিনিকেতন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে যোগাযোগ রয়ে গেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে অনেক কিছুই জানা যাবে।[২১] কারণ ডাকাতদলের সর্দার হিসাবে যে পরিচয়ের আবরণ তাঁকে দেওয়া হয়েছে তার উন্মোচন হলে শান্তিনিকেতনের সুরক্ষাকর্মীর পরিবারের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হবে। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে যে অংশের বা পরিচ্ছেদের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সেটি প্রায় আলো আঁধারে রয়ে গেছে।

'শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

রূপান্তরের পথপরিক্রমায় শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেবের আগমন ও বামাচারী তান্ত্রিকের সিদ্ধাসনে ব্রহ্মানন্দলাভ—পূর্ব নির্দিষ্ট ঘটনা ছাড়া আর কী হতে পারে? একেশ্বরবাদী দেবেন্দ্রনাথের সাধন সংস্কারে এ কোনো অন্তরায় হয়ে ওঠে নি। নচেৎ অন্তর্যামীর নির্দেশে হিমালয় থেকে নীচে নেমে এসে ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসবেনই বা কেন? এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। এ জন্য প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন—"রায়পুর থেকে এই আদিবাসী ছাতিমগাছ দুটির দূরত্ব অন্তত সাত-আট মাইল হবে। শুধু দূরত্ব নয় এখানে তাঁর আসবার কোন কারণও ছিল না। অবশ্য এই জায়গাটা রায়পুরের সিংহবাবুদের জমিদারীর অন্তর্গত। কিন্তু সেটাও এখানে মহর্ষির আগমনের যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। এখানে তাঁর আগমনের কারণ আজ পর্যন্ত রহস্যময় হয়ে আছে। ...জমিটা দেখতে হলো একটা কড়াইকে উপুড় করলে যেমন আকার হয় অনেকটা তেমনি।"[২২] —অর্থাৎ তন্ত্রমতে সাধনপীঠের সংজ্ঞাটা হল স্থানটি কচ্ছপের পিঠের আকারের মতো হতে হবে। তিনি এ বিষয়ে সেই ইঙ্গিতটাই দিয়েছেন।

অনেকের কাছে বামাচার সাধনা সম্বন্ধে নানা রকমের ধারণা আছে। কেউ কেউ একে ব্যভিচার মনে করেন। কিন্তু মেরুতন্ত্রে বামাচারী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা হল—"পরদ্রব্যের প্রতি যিনি অন্ধ, পরস্ত্রীর প্রতি যিনি নপুংসক এবং পরনিন্দায় যিনি মূক এবং সর্বদা জিতেন্দ্রিয় তিনিই প্রকৃত

বামাচারীসাধক হতে পারেন।" অতএব এইরূপ এক ব্রহ্মচারীর সাধনক্ষেত্রে মহর্ষিদেবের ব্রহ্মানন্দ লাভ হলে তা কতখানি রীতি বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হতে পারে তা আমাদের জানা নেই।

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় অভীষ্টলাভ ছিল মহর্ষিদেবের একান্ত ব্যক্তিজীবন-নির্ভর। ব্রাহ্মসমাজের সাধনশৈলীর অনুশাসন তখন ছিল না। 'আত্মার শান্তি, প্রাণের আরাম ও মনের আনন্দ' উপলব্ধি হলে তিনি মূল 'শান্তিনিকেতননামাগৃহ'টি সংস্কার করিয়ে মাঝে মধ্যে এসে থাকতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে থাকতেন রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়, আর রক্ষী দ্বারিক সর্দার এবং হরি, হরিশ নামে মালিরা।

এই ভাবেই মহর্ষিদেব মাঝে মধ্যে এখানে থেকে শান্তিনিকেতনের সংস্কার শুরু করেন অন্তত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—এ কথা মহর্ষির কাগজপত্রে রয়েছে। কিন্তু ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাস বা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তিনি মুসৌরী পর্বতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পাটনায় পৌঁছে সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর সেখান থেকে তিনি সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। শান্তিনিকেতন থেকে মহর্ষিদেব কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রে এইটিই ছিল তাঁর শেষ আগমন। এরপর আর তিনি এখানে আসেন নি। ফলে শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সাধনক্ষেত্র ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। এ সব শুনে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেতেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়কে লেখা পত্রে সে অবস্থার কথা জানা যায়। (আপনার বিরহে এ শান্তিনিকেতনে আজ গোলাপ ফুল ফোটে নাই ইত্যাদি। দ্রঃ মহর্ষির পত্রাবলী) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও শ্রীহীন শান্তিনিকেতনের কথা লিখে গেছেন।

এদিকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে দুটি ধর্মসভা স্থাপিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল হরিসভা। বোলপুরের ব্যবসায়ী মহাত্মা সারদাপ্রসাদ পাল মহাশয়ও একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। এই সভায় ভগবদ্‌গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ হত। বোলপুরের বারোয়ারীতলার গৃহে ধর্মসভা বসত। এ ছাড়া বোলপুর সন্নিকট বাঁধগোড়া গ্রামে ছিল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। সেখানে বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন দ্বিতীয় শিক্ষক। এঁরা উভয়েই ব্রাহ্ম ছিলেন। শশিভূষণ বাবুর বাসায় 'প্রার্থনাসমাজের' সভা হত। নবীন বাবু এই সভায় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করতেন। অপ্রকাশিত সুরুল নথিতে নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অনেকগুলি পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে বাঁধগড়া স্কুলের প্রসঙ্গে। চিঠিগুলি সুরুলের সরকার বাড়ির জমিদার মোহিনীমোহন সরকারের উদ্দেশ্যে লেখা।

বোলপুরের হরিসভার অধিবেশন বসত কালিকাপুর পট্টীর বারোয়ারীতলায়। ধর্মসভায় সাধক ভক্তজনের যথেষ্ট আগমন ঘটত এখানে। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু শশিভূষণ বসু, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 'নববিধান সমাজের' বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন ঘটত। 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার ১৮০৬ শকাব্দ বা ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক সংখ্যার ১৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "পূর্বে এ স্থানে ধর্ম বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা ছিল না। বিগত চৈত্রমাসে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারক এখানে আসেন। তারপর হইতেই ধর্ম সম্বন্ধে অনেকটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এখন দুইটি 'হিন্দুধর্মসভা' ও একটি 'প্রার্থনাসমাজ' সংস্থাপিত হইয়া প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর নিয়মিত উপাসনা হইতেছে। 'সমাজগৃহ' না থাকায় সম্পাদক মহাশয়ের বাসাতেই উপাসনা কার্য্য নির্বাহ হইতেছে।"[২৩]

ক্রমে বোলপুরের 'ধর্মসভা' 'প্রার্থনাসমাজের' ভক্তজনেরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত শান্তিনিকেতনে এসে ব্রাহ্ম উৎসব করেছিলেন ১২৯১ সালে। তত্ত্বকৌমুদীর (১৮০৬ শকাব্দ) ১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখা হয়েছে—"১৭ই কার্তিক শনিবার প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শান্তিনিকেতনে উপাসকদিগের নির্জন উপাসনা, তৎপর সংগীত ও প্রার্থনা। ১৯ কার্তিক সোমবার প্রাতে শান্তিনিকেতনে উপাসনা হয়। বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা কার্য করেন। ...বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় উৎসবের পূর্বে এখানকার বোলপুরের ধর্মসভাতে "মুক্তি কিরূপে লাভ করা যায়" এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন ও তৎ পরদিন শান্তিনিকেতনে স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত উপাসনা হয়।"

তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদ অনুসারে জানা যায় ১২৯৩ সালের ১৮ বৈশাখ প্রথমে বোলপুরে পরের দিন ১৯শে বৈশাখ মহর্ষির শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মধর্মের উৎসব পালিত হয়। ১৮ বৈশাখের উপাসনায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্যের কাজ করেন এবং ১৯ বৈশাখ শান্তিনিকেতনের উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা পরিচালনা করেন। (দ্রঃ তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৮ শক)

বলা বাহুল্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে তাঁর মামা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওষুধের ব্যবসায়ে সাহায্য করতে আসেন। এখানে এসে বোলপুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বোলপুরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাল, উকিল হরিদাস বসু, মোহনপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত রামনাথ সামন্ত, বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, অনুকূলচন্দ্র রায়, তিনকড়ি ঘোষ, রায়পুরের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবরাজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া বাঁধগড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের (এখন যেটি বোলপুর হাইস্কুল) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মিত্র এবং দ্বিতীয় শিক্ষক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমে গভীরতর হয়ে ওঠে। সকলেই বোলপুরের ধর্মসভা, হরিসভা ও প্রার্থনা সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং মহর্ষির শান্তিনিকেতনের প্রতি এঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল।

এইসব গুণীজনের মধ্যে রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল সিউড়ীর নিকট মল্লিকপুর গ্রামে। তিনি কোলকাতায় কলেজে পড়ার সময় বোলপুরে প্রায় আসতেন। মাঝে মধ্যে অঘোরবাবুর কাছে থেকে বাড়ি ফিরতেন। এঁদের মধ্যে সৎপ্রসঙ্গ ও সাহিত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত। ব্রজেন্দ্রবাবু, তিনকড়িবাবু ও দেবরাজবাবু সিউড়ীর উকিল ছিলেন। এছাড়া বোলপুর সন্নিকট মোহনপুর গ্রামের রামনাথ সামন্তও সিউড়ীতে মোক্তারী করতেন। এই সামন্ত পরিবারের অনেকেই সিউড়ীতে থাকতেন ও ওকালতি করতেন। পরে এঁরা অনেকেই সিউড়ী শহরে থেকে যান। তাঁদের নামে একটি বাজার আছে যেটিকে 'সামন্তবাজার' বলা হয়। রাখালদাসবাবু চাইবাসার সম্ভ্রান্ত উকিল ছিলেন। তিনি তিন হাজার টাকা খরচ করে পিতার স্মৃতিতে "বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন" নামে সিউড়ীতে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে দেন।

মোহনপুরের রামনাথ সামন্ত ছিলেন অঘোরনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ঈশ্বর অনুরাগী মানুষ। অঘোরবাবুকে লেখা তাঁর পত্রাদিতে সে অনুরাগের ছোঁয়া স্পর্শ করা যায়। "যদি সেই সত্যস্বরূপ দয়াময়ের প্রতি একান্ত ভক্তি থাকে তাহা হইলে শত সহস্র অত্যাচার মস্তকের উপর দিয়া এমনভাবে যাইবে যে আপনি তাহা অত্যাচার বলিয়া জানিতে পারিবেন না।" রামনাথবাবু কর্মোপলক্ষে কানপুরে থাকাকালীন ১২৯৩ সালে বা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জ্যৈষ্ঠ অঘোরবাবুকে লেখা পত্রে এমন কথা লিখেছেন। এছাড়া ঐ বছরেই শ্রাবণ মাসে তিনি বোলপুরে এসে আবার এলাহাবাদ যান। এলাহাবাদে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও ব্রাহ্মধর্মের গ্রন্থ অনুবাদক শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কারণে প্রসাদজী মহর্ষিদেবকে সব কিছু লিখে রামনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ক্রমে রামনাথবাবু মহর্ষিদেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় অনুরক্ত হয়ে মহর্ষিদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রিঃ) মহর্ষিদেব অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর এই সংকটকালে রমানাথবাবু সবসময় কাছে থেকে সেবা যত্ন করতেন। এই সময় মাঝে মধ্যে বোলপুর শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ উঠলে রামনাথবাবু বোলপুরের ধর্মসভা, হরিসভা ও প্রার্থনাসমাজের কথা বলতেন এবং অঘোরনাথের প্রসঙ্গও আলোচনায় স্থান পেত। অঘোরবাবু যে মহর্ষিদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী সে কথাও রামনাথবাবু তাঁকে জানাতেন। মহর্ষিদেব আরোগ্য লাভ করলে তিনি অঘোরনাথকে কোলকাতায় ডেকে পাঠান। রামনাথবাবু এই প্রসঙ্গে অঘোরনাথকে লেখেন (১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৮৮৭ খ্রিঃ ৩০ শ্রাবণ) "প্রণামা নিবেদন মিদং- আঙ্গুলের বেদনা ভালো হইয়াছে তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনি ১লা কি ২রা অতি অবশ্য আসিবেন। মহর্ষি মহাশয় শারীরিক ভালো আছেন। এখানে আসিবার পক্ষে অন্যথা না হয়। আপনার সহিত অনেক কথা আছে....।"

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্র পেয়ে ৩১ শ্রাবণ কোলকাতা যান এবং পরদিন ৩২ শ্রাবণ (১২৯৪ সাল) মহর্ষিদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় তিনি তৎকালীন আবাসস্থান মিডলটন রোড ভবনে থাকতেন। পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও রামনাথবাবু অঘোরবাবুকে পরম আদরে আপ্যায়ন করেন এবং 'ব্রাহ্মধর্মগীতা' গ্রন্থখানি উপহার দেন। প্রিয়বাবুর এই গ্রন্থখানি মহর্ষিদেবের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ।

এই সময় মহর্ষিদেবের বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর তিন মাস। শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও "যোগাগ্নিময় শরীর ব্রহ্মবর্চ্চসে সমুজ্জ্বল" ছিল। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—"৩২ শ্রাবণ ১২৯৪ সালে (১৮৮৭ খ্রিঃ) বেলা তিনটার পর মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইদিন জীবনের অতি পবিত্র দিন।" মহর্ষিদেবের সান্নিধ্যে এসে অঘোরবাবুর অধ্যাত্মভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল।

এরপর বোলপুরের হরিসভা, ধর্মসভা, প্রার্থনাসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মহর্ষিদেব আলোচনা করেন। শান্তিনিকেতনের ভাঙাভঙ্গ শ্রীহীন অবস্থা, উপাসনাগৃহের অভাব ইত্যাদি নিয়েও ভাবনা চিন্তা-শুরু হয়। মহর্ষিদেবের সঙ্গে এসব ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা সেরে অঘোরনাথবাবু বোলপুরে ফিরে আসেন।

দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদিকে রামনাথ সামন্ত মহাশয়ও শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহর্ষিদেবের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পুনরায় অঘোরবাবুকে কোলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়। ১২৯৪ সালের ২৩ ফাল্গুন তিনি কলকাতা যান। মহর্ষিদেব তাঁকে তাঁর শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রের সংস্কার ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনার কথা বলেন। আর বাৎসরিক ১৮০০ (আঠার শত টাকা) টাকা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করেন মহর্ষিদেব। এ ছাড়া ঠিক হয় যে মঠের মঠধারীর মতো শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আশ্রমধারী নিযুক্ত করা হবে। সেইমতো বর্ধমানের সাধুবাবাজি নামে পরিচিত শ্রীযুক্ত দেব প্রতিপালক বাবাজিকে এখানে আশ্রমধারী নিযুক্ত করা হবে। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে দুদিন ধরে বিস্তৃত আলোচনা ও পরিকল্পনা করে ১২৯৪ সালের (১৮৮৮ খৃঃ) ২৬শে ফাল্গুন মহর্ষিদেব বার্ষিক ১৮০০ টাকা (আঠার শত টাকা) আয়ের সম্পত্তি দান করে ট্রাস্টিডিড সম্পাদন করেন। এই ডিডের উল্লিখিত ব্যক্তিরা হলেন শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায় পিতা ললিতমোহন

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী পিতা কৃপানাথ মুন্সী। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮১০ শকাব্দে ট্রাস্টিডিডটি মুদ্রিত আছে। যেমন—"শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাং যোড়াসাঁকো কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাং মানিকতলা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী। হাং সাং পার্কস্ট্রিট্ কলিকাতা।

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর সাকিম সহর কলিকাতা যোড়াসাঁকো হাল সাং পার্কস্ট্রিট।"[২৪] (দ্রঃ মহর্ষিদেব কৃত ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (১৮৮৮ খৃঃ) ট্রাস্টডিড পত্র)

অতঃপর ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খৃঃ) শান্তিনিকেতনগৃহ মেরামত ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়। কোলকাতা থেকে একজন কর্মচারী এখানে এসে কাজ শুরু করেন। অন্যদিকে প্যারীলাল ঘোষ ওঙ্কারনাথে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে 'মৌনীবাবা' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি এখানে থাকার অভিপ্রায়ে আসেন কিন্তু গৃহ মেরামত না হওয়ায় ফিরে যান।[২৫]

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা

শান্তিনিকেতনগৃহ মেরামত বা সংস্কার করার পর ১২৯৫ সালের ৪ কার্তিক (১৯ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ) শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ যাবৎ শান্তিনিকেতন ছিল মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্র। কিন্তু মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্রের নবরূপায়ণ হল শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমরূপে। মহর্ষিদেব ট্রাস্টিডিড সম্পাদন করে সাধনক্ষেত্রকে আশ্রম হিসাবে রূপ দিলেন এবং তার রূপান্তর ঘটে গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে শান্তিনিকেতন গৃহটি সজ্জিত করা হল। সমস্ত রকম আসবাবপত্র দিয়ে বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করালেন তিনি। তাঁর সংগৃহীত বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত গ্রন্থাদি নিয়ে একটি ছোট গ্রন্থাগারও স্থাপন করে দিলেন। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের গ্রন্থাগারটিই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বীজ বা সূচনাপর্ব বলা যায়। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার স্থাপনের ইতিবৃত্ত রচিত হলে দেখা যাবে মহর্ষিদেবের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনগৃহে ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারটিই ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হিসাবে বৃহৎ কলেবর ধারণ করেছে এবং তার সূচনাকাল হল—১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর।

যাইহোক মহর্ষির নির্দেশে তাঁর পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আসেন ১২৯৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন কার্তিক মাস নাগাদ। তিনি ৩-রা কার্তিক অঘোরনাথবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন। পিতামহের ইচ্ছানুসারে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় উভয়ের মধ্যে। মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গুণীজন সকলেই এলেন। এবং ১২৯৫ সালের ৪ কার্তিক শাস্ত্রসম্মতভাবে এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ৪ঠা কার্তিক বৈকাল বেলায় বোলপুর, সুরুল, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামের "প্রায় দুইশত হিন্দুসমাজের গুণীজনের আগমন ঘটে"। এই প্রতিষ্ঠা সভায় রবীন্দ্রনাথ ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় দুজনে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। মোহিনীবাবুর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রনাথের গান সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীত

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় দু' চারখানি সংগীত পরিবেশন করেন। সভাশেষে সমাগত সকলকে সরবৎ এবং পান দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্র ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমরূপে পরিচিত হল।

এরপর ৯ই কার্ত্তিক ১২৯৫ সাল (১৮৮৮ খৃ:) থেকে নিয়মিতভাবে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা শুরু হয়। ওই দিনটিতে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমের আচার্য্যের কাজ পরিচালনা করেন। অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় সংগীত পরিবেশন করেন। ১১ কার্ত্তিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে অঘোরবাবুর দীর্ঘ তিনঘণ্টা ধরে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়। অতঃপর দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অঘোরবাবুকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। ২৪ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওই দিন ছিল বুধবার আর ওই বুধবার থেকেই সাপ্তাহিক উপাসনা শুরু হয় এবং আশ্রমের ছুটির দিন হিসাবে প্রচলিত হয়ে আসছে।

সন ১২৯৫ সালের ৪ কার্ত্তিক ইংরেজি ১৯ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা হলেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর তিন পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, নীতিন্দ্রনাথ এবং দ্বিপেন্দ্রনাথের দুই বৎসরের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়া এসেছিলেন মোহিনীমোহন, রমনীমোহন, রজনীমোহন, যোগিনীমোহন, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নীরদনাথ মুখোপাধ্যায় পারিবারিক চিকিৎসক বিপিনচন্দ্র কোঙর, সস্ত্রীক অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নীরদনাথ ছিলেন গগনেন্দ্রনাথের পিসি কুমুদিনীর ছেলে ও রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী; এঁরই ছেলে নীলনাথের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়িনীর মেয়ে প্রতিমাদেবীর প্রথম বিবাহ হয়েছিল।[২৬]

আচার্য ও আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর থেকে অঘোরবাবু শান্তিনিকেতন আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করে সপরিবারে এই নির্জন আবাসে থেকে গেছেন। মহর্ষিদেবের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ জন্য মামা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওষুধের ব্যবসায়ে ক্ষতি হলেও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আরব্ধ কর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনিই আশ্রমের আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন আশ্রমের আচার্য্যপদে ব্রতী হলেও মহর্ষিদেব চেয়েছিলেন তিনি আশ্রমের আশ্রমধারীর দায়িত্বও যেন পালন করেন। সেইমতো ১২৯৫ সালের ২১ কার্ত্তিক (১৮৮৮ খ্রিঃ) তিনি মহর্ষিদেবের আহ্বানে কলকাতা যান। ২২ কার্ত্তিক উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। অঘোরনাথ তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন—"ইতঃপূর্ব্বেই ট্রাস্টিরা ও মহর্ষি মহাশয় আমাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী নিযুক্ত করা স্থির করিয়াছেন। প্রথমে মহর্ষি মহাশয়কে প্রণাম করিলেই উপবেশন করিতে বলিলেন;তৎপরে বলিলেন—'ট্রাস্টিদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, তুমি শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী হও।' আমি তাহাতে আহ্লাদসহকারে সম্মতি দিলাম। 'ধর্ম্ম লইয়া থাক, তোমার আত্মার উন্নতি হইবে। তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার কোন ভাবনা নাই, আমি তোমাকে বরণ করিলাম, গ্রহণ করিলাম।' তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, 'অঘোরনাথ যাহাতে সুখে

স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।' তৎপরে আমাকে বলিলেন 'আজ প্রথম দিন, তোমাকে কিছু উপদেশ দিই।' এই বলিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে অনেক উপদেশ দিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ ও প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যা করিলেন, এবং নিজের জীবনের ৩টি ঘটনা হইতে পরকালের ভাব বুঝাইলেন। শেষে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, 'অঘোরের স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে, আমি গ্রহণ করিলাম, তোমরা রক্ষা করিবে।' আমি প্রায় ৩ ঘণ্টা সেদিন ছিলাম।

প্রথম আশ্রমধারী
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

তৎপরে কএকদিন পার্কস্ট্রীটের বাটীতে থাকিয়া শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উপাসনা প্রণালী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের হ্রস্ব দীর্ঘ ও উদাত্ত অনুদাত্ত ভেদে বৈদিক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা অভ্যাস করিলাম।"[২৭]

মহর্ষিদেবের কাছে সাদরে বরণ লাভ করে অঘোরনাথ শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। একাধারে আশ্রমের আচার্য হিসাবে উপাসনা পরিচালনা করা এবং আশ্রমধারী হিসাবে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। এক কথায় শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেবের সাধনপীঠে আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ার যুগে তিনিও একজন স্থপতির ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই ১২৯৫ সাল থেকে ১৩০৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮৮ খৃ: থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মহর্ষির শান্তিনিকেতন ছিল প্রাণতুল্য আধ্যাত্মিক উত্তরণের পীঠভূমি। এরপর তিনি এখান থেকে চলে গেলে আশ্রমধারী হিসাবে পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মহাশয় এ দায়িত্ব পালন করেন।

শান্তিনিকেতনে উপাসনাগৃহ বা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা

শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম হিসাবে রূপলাভ করার পর আশ্রমের গঠনশৈলীতে ব্রাহ্মধর্মের উপাসনারীতি প্রবর্তিত হয়। উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা গৃহের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শান্তিনিকেতনের রূপান্তর পর্বে ব্রাহ্মভক্ত ও গুণীজনের আগমন হতে থাকে। প্রথম প্রথম 'শান্তিনিকেতনগৃহে'ই উপাসনা কর্ম চলত। ফলে এখানে স্বতন্ত্র উপাসনাগৃহের প্রয়োজন বোধ করেই মহর্ষিদেব উপাসনামন্দির নির্মাণ করান। সেইমতো ১৮৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর অর্থাৎ ১২৯৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণ শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মহর্ষিদেবের ইচ্ছায় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওই দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সস্ত্রীক সত্যেন্দ্রনাথ, পুত্র কন্যা সহ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্দ্রনাথ। এই উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন।

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনকালে একটি তাম্রফলকে খোদিত ছিল "ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমহর্ষিনা শ্রীমতাদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মনা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতং মিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক ১৯৪৮ সম্বৎ ৪৯৯১ কল্যাব্দ অগ্রহায়ণ ২২ রবিবার।" উক্ত তাম্রফলকটি ছাড়াও সেই দিনের স্টেটস্ম্যান পত্রিকা, সেই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পঞ্চরত্ন এবং প্রচলিত মুদ্রা মন্দিরের ভিত্তিমূলে প্রোথিত করা হয়। মন্দিরের পঞ্চচূড়ার শীর্ষদেশে "ওঁ তৎসৎ ঋতংসত্যং" কথাগুলি লিখে তা স্থাপন করা হয়। পরে সেগুলি ভেঙে গেলে আর স্থাপন করা হয় নি।

মন্দির নির্মাণ শেষ হলে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ বা ইংরেজির ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার নির্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা উৎসবে অছিনামার অংশ (Trusty deed) উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করেন তিনি।

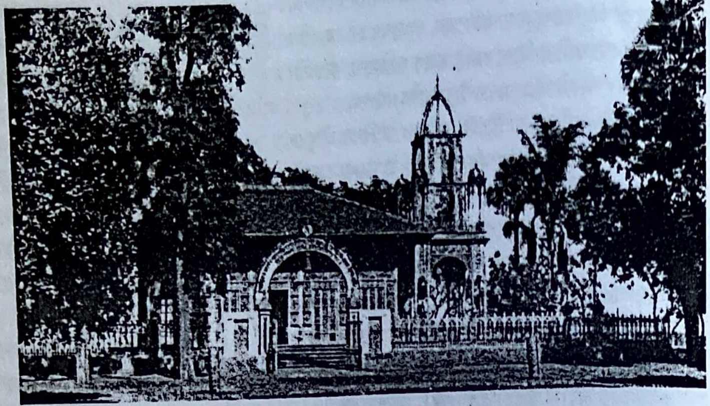

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির

"অদ্য সর্ব্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক এই শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতি ধর্ম্ম অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণির ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল। এই শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশুপক্ষি, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি এই শান্তিনিকেতনে হইতে পারিবে না। কোনো ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্যদেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এইস্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনা ও ধ্যান ধারণাদির উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়।" এই প্রতিষ্ঠাপত্রটি মহর্ষির ট্রাস্টি ডিডের অনুরূপভাবে রচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই দিনের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সকালের উপাসনায় বেদি গ্রহণ করেন পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং অচ্যুতানন্দ স্বামী। বক্তৃতা করেন শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। দ্বিপ্রহরে অধ্যাপক বিদায় এবং সন্ধ্যাকালের প্রার্থনায় শিবনাথ শাস্ত্রী বেদি গ্রহণ করেন।[২৮]

সন ১২৫০ সালে বা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট কুড়িজন ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করেন। ৭ই পৌষ সে কারণেই তাঁর জীবনের পবিত্র ও স্মরণীয় দিন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"তবে মন্দির

প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত তিনি ৭ই পৌষ দিনটি নিয়ে খুব বেশি ভাবনা চিন্তা করেননি।"—শান্তিনিকেতনে আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মহর্ষিদেব ৭ পৌষ-এর পবিত্র দিনটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই ৭ই পৌষ ১২৯৮ বা ২১শে ডিসেম্বর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করলেও মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কিন্তু ১২৯৭ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৯০ সালের ৭ই ডিসেম্বর শুভ দিনে জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হাত দিয়েই সম্পন্ন করিয়েছিলেন। আমাদের অনুমান মহর্ষিদেব তিথিতত্ত্ব অনুসারেই একাজ করিয়ে থাকবেন। কারণ পৌষমাস পুষ্যা নক্ষত্র এবং শুভ কাজ বিশেষ করে গৃহ মন্দিরাদির ভিত্তি স্থাপন করা হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেবের সিদ্ধিলাভ করার পর স্থানটি এক রকম অনাদরেই পড়ে ছিল। মহর্ষিদেব এখানে আসা ও ব্রহ্মোপলব্ধির পর স্থানটির পরিচয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠার পর 'মহর্ষির শান্তিনিকেতন' হিসাবে খ্যাত হয়। শান্তিনিকেতনের নবরূপায়ণ ঘটে গেল ১৮৬৩ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের.মধ্যে। এই পর্বের অনেক ঘটনা আজও অজানা থেকে গেছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রমধারী পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র

মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্রে আশ্রম ও ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হলে এখানকার আচার্য ও আশ্রমধারী হিসাবে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পদমর্যাদা রক্ষা করে মহর্ষি প্রদত্ত গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। পরবর্তী পর্বে আশ্রমের আশ্রমধারী ও মন্দিরের কাজে যিনি যোগদান করলেন তিনি হলেন আর্যসমাজের বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মহাশয়। অথচ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এইসব নিষ্ঠাবান গুণীজনেরা কেমন করে স্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর বা ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ। ৭ই পৌষের পবিত্র দিনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মন্দিরের বেদীতে উপবিষ্ট হয়ে উপাসনার মধ্য দিয়ে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। আশ্রমের পূর্ণতা এসেছিল ঐ পবিত্র দিনটিতে। শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্ত নিয়ে অনুসন্ধান করলে মনে হয় শান্তিনিকেতন আজ বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হলেও সেদিন 'আর্যসমাজ কলিকাতার' যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মশাই মন্দিরের বেদী অলঙ্কৃত করে বৈদিক মন্ত্রপাঠ করেছিলেন তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য সব কিছুই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদন সাপেক্ষেই ঘটেছিল—এবং এ মত সাড়ে ষোল আনাই ঠিক। এখানে কোনো দ্বিমতও নেই।

এখন প্রশ্ন কে এই উপেক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমশাই, যিনি অঘোরনাথের পর আশ্রমের 'আশ্রমধারী' হয়েছিলেন, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমদেবতা' হিসাবে উল্লেখ করে গেছেন? শান্তিনিকেতন আশ্রমে সম্মানের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও কেন আজও উপেক্ষার অন্তরালে চলে গেলেন? এ প্রসঙ্গে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে শান্তিনিকেতনের গড়ার যুগে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, যে সব ঘটনা ঘটেছিল, যাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনায় মহর্ষিদেবের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাঁদের প্রতি ধারাবাহিক ও সচেতন উপেক্ষা এখানে অচলায়তন হয়ে বসে আছে। সেই দীর্ঘ তালিকার অন্যতম হলেন পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র। পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবার আজ বোলপুরে 'ডাঙ্গালী কালীমায়ের পুরোহিত' হিসাবে পরিচিত হয়ে স্মৃতির শান্তিনিকেতনকে পরিবারের মধ্যেই ধরে রেখেছেন।

আশ্রমধারী পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন—"মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মহর্ষিদেব ইচ্ছা করেন যেন সেখানে প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের ব্রহ্মোপাসনা

অংশটি নির্ভুল উচ্চারণের সঙ্গে পাঠিত হয় এবং এজন্য অচ্যুতানন্দ স্বামী নামে একজন উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি 'পণ্ডিতজী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভাষা এবং তাঁর ভাঙা ভাঙা বাংলা ভালো বুঝতাম না। কিন্তু মন্ত্র পাঠ ভালো লাগতো। তাঁর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। ব্রাহ্মণ স্বপাক খেতেন। ইনি পরে 'আশ্রমধারী' হন। এঁর মৃত্যুর পরে এরই পুত্র মন্দিরে মন্ত্রপাঠ করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। অচ্যুতানন্দ স্বামী আসার পরে তিনি দুবেলা মন্দিরে মন্ত্রপাঠ করতেন। কেবল রবিবারের বৈকালে বোলপুরের উপাসকেরা সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতে আসতেন। তখন পিতৃদেব পণ্ডিতজির সঙ্গে বেদী গ্রহণ করতেন।"[২৯]

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় "দশম মন্দির প্রতিষ্ঠাবর্ষ উপলক্ষে" লিখেছেন—"৭ই পৌষ সন্ধ্যায় উপাসনায় মঠাধ্যক্ষ স্বামীজি অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত ঘনঘন ঘণ্টারবের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রবীন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদী গ্রহণ করিলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মমন্ত্র নামে ভাষণ পাঠ করিলেন।[৩০]

তিনি আরো লিখেছেন—"মন্দিরের উপাসনা ও স্বাধ্যায় পাঠাদি করিতেন অচ্যুতানন্দ পাঠক, উত্তর ভারতে তাঁহার বাড়ি। মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসংগীত গাইতেন দুইজন স্থানীয় বেতনভোগী লোক, সুরুল গ্রামের রসিকদাস ও সর্পলেহনা গ্রামের শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য।

অচ্যুতানন্দ পাঠকের পুত্র পরশুরাম মন্দিরের উপাসক ছিলেন। ইনি ভুবনডাঙ্গায় যে বাড়িতে থাকিতেন তাহা পরে এস্টেটের কর্মচারী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পান। অচ্যুতানন্দ বৃদ্ধ বয়সে একবার আসেন। হিন্দীতে "ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানাদি" অনুবাদক বলিয়া মনে হয়।[৩১]

আদি ব্রাহ্মসমাজে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজের প্রভাব

দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কলকাতা আসেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর। এখানে থাকাকালীন মহর্ষি দয়ানন্দের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় কলকাতায় তৎকালীন গুণীজনেরা খুবই আকৃষ্ট হন। তিনি ৩৪তম মাঘোৎসবে যোগ দিতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু মহর্ষি দয়ানন্দের আর্যধর্মের গুরুত্ব অনুভব করেন। এরপর ১৮৮৫ সালে কলকাতায় 'আর্যসমাজ কলিকাতা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্যোক্তা ছিলেন ভাগলপুরের জমিদার ও স্বামী দয়ানন্দের শিষ্য তেজনারায়ণ সিংহ ও তাঁর আত্মীয় মহাবীর প্রসাদ। প্রতিষ্ঠাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, রাজনারায়ণ বসু উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো গুণীজনেরা এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান ন্যায়াধীশ পণ্ডিত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সুপুত্র পণ্ডিত শঙ্করনাথ পণ্ডিত। সভার সংযোজক ছিলেন রাজা তেজনারায়ণ সিংহ। মহাবীর প্রসাদ দীর্ঘদিন এই 'সমাজের মন্ত্রী' ছিলেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু অত্যন্ত অনুরক্ত হন। এঁরা ব্রাহ্মসমাজী হলেও আর্যসমাজের সাধনরীতির 'হবনপদ্ধতি' তাঁরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধনপদ্ধতির সঙ্গে আর্যসমাজের নিরাকার সাধনা ও আর্যধর্মের রীতি হিসাবে 'হবন' বা 'যজ্ঞ' করার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। 'শান্তিনিকেতনের' ব্রহ্মমন্দিরে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও হবন পদ্ধতিকে গ্রহণ করে এখানে তা প্রবর্তনের সম্মতি দেন তিনি। দুটি ধর্মের পদ্ধতি ও বিশ্বাস এত কাছাকাছি ছিল যে সেকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধনপদ্ধতির মধ্যে আর্যসমাজের অনেক সাধনশৈলী গৃহীত হয়েছিল।

পণ্ডিত উমাকান্ত উপাধ্যায় লিখেছেন—"স্বামী দয়ানন্দের বৈজ্ঞানিক উদার দৃষ্টিভঙ্গি সকলের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এ বিষয়ে ভালো এবং অনুকূল প্রভাব পড়িয়াছিল। তিনি আর্যসমাজ কলিকাতার প্রসিদ্ধ বিদ্বান এবং কর্মকর্তা পণ্ডিত শঙ্করনাথ পণ্ডিতের নিকট যাজ্ঞিক পণ্ডিত পাঠাইবার অনুরোধ করেন যাহাতে তিনি তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া তাঁহার দ্বারা স্থায়ীভাবে বেদ পাঠ এবং হবন করাইতে পারেন। পণ্ডিত শঙ্করনাথজী পণ্ডিত অচ্যুত মিশ্র নামক একজন পণ্ডিতকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন। পণ্ডিত অচ্যুত মিশ্র সেখানে বহুদিন ছিলেন। তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেও শান্তিনিকেতনে নিয়মিত হবন হইত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর স্বামী দয়ানন্দের প্রভাব এতদুর বিস্তৃত হইয়াছিল যে সম্ভবতঃ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রভাব তাঁহার মস্তিষ্কে কোথাও ছিল। প্রারম্ভিক অবস্থায় শান্তিনিকেতনকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমই বলা হইত। যতদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত ছিলেন ততদিন শান্তিনিকেতনে নিয়মিত হবন হইত।"

পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী লিখেছেন—"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে পণ্ডিত শঙ্করনাথ আর্যসমাজের পণ্ডিত অচ্যুত মিশ্রকে শান্তিনিকতনে (বোলপুরে) দৈনিক হোম করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। যতদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত ছিলেন ততদিন সেখানে দৈনিক হোম হইত।"

পণ্ডিত শঙ্করনাথ পণ্ডিত লিখেছেন—"আজকাল ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজের মধ্যে কোন বৈমনস্য নাই। বহুপূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজকে একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীবলয়েন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লাহোর আর্যসমাজে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবল আগ্রহে আর্যসমাজের পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুত মিশ্রকে বোলপুর শান্তিনিকেতনে প্রত্যহ হোম করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল। যতদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত ছিলেন ততদিন সেখানে প্রত্যহ হোম হইত।"[৩২]

সত্যাত্মপ্রকাশ গ্রন্থেও বলা হয়েছে—"এঁরা ব্রাহ্মসমাজী হলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ অগ্নিহোত্রের উপযোগিতা স্বীকার করেছিলেন। এর পরই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর্যসমাজের পক্ষ হতে পণ্ডিত শঙ্করনাথ বোলপুর শান্তিনিকেতনে উপাসনা বেদীর সম্মুখে হোম করার জন্য পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্রকে প্রেরণ করেন।"[৩৩]

প্রাপ্ত ঘটনাসমূহ থেকে কি মনে হয় যে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সাধনশৈলী অনুরূপ হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও মন্দিরে হোম পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন মহর্ষিদেব। সেইমতো বলা যায় কি শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হোমযজ্ঞ করেই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল? তবে পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মহাশয় সেদিনের পুণ্যলগ্নে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একই আসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে সাদরে বরণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মহাশয় ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর আদি নিবাস ছিল বিহারের ছাবরা জেলার বেলিয়াপুর থানার বেদৌলী গ্রামে। তিনি কাশীতেই সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যয়ন করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আর এখানেই স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আর্যসমাজী পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত হন। পরে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'আর্যসমাজ কলিকাতা' প্রতিষ্ঠা হলে এখানকার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বোলপুরের মিশ্রপরিবারের সূত্র অনুসারে জানা যায় শঙ্করনাথ পণ্ডিতের বাড়িতেই তিনি প্রথম আসেন পারিবারিক শাস্ত্রীয় কর্মে যোগ দিতে। পরে এঁদের পরিবারের সঙ্গে অচ্যুতানন্দ মিশ্রের পরিবারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এই সম্পর্ক প্রায় চারপুরুষ ধরে টিকে ছিল। অচ্যুতানন্দের প্রপৌত্র বিদ্যাসাগর ও বিদ্যারত্ন মিশ্রের সময় পর্যন্ত এঁদের পারিবারিক

সুসম্পর্ক ছিল। বিদ্যাসাগর ও বিদ্যারত্ন মিশ্র শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পরিবারের আশ্রয়ে থেকে কলকাতায় সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে এ সম্পর্ক প্রায় ক্ষীণ হয়ে গেছে।[৩৪]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিত্য হোম কর্ম চলেছিল এবং পণ্ডিত মহাশয় নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ করে গেছেন। মহর্ষিদেব ১৯-১-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দেহ রাখেন ; তারপর শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবর্তনের সূচনা হয়। শান্তিনিকেতন আশ্রম মূলত ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমরূপেই পরিগণিত ছিল। কিন্তু নিছক আদি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রম থেকে শান্তিনিকেতনের সীমাবদ্ধ পরিচিতির বিস্তার ঘটল রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পত্তনের পর থেকেই শান্তিনিকেতনের রূপান্তর ঘটতে শুরু করল। ব্রাহ্মধর্মের সাধনশৈলীর বাঁধন অনেকখানি শিথিল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে আসতে না পারলে শান্তিনিকেতন গতানুগতিকতার স্রোতে থেকে যাবে। তাই পিতার ইচ্ছার অনুরূপ বা পিতার আরব্ধ চিন্তার 'বৈদিক বিদ্যালয়' বা 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপন করে শান্তিনিকেতনের নবরূপায়ণ ঘটালেন—ছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম, তার সঙ্গে যুক্ত হল 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়'। এর ফলে শান্তিনিকেতনের কর্মক্ষেত্র দীর্ঘতর হওয়ায় আর্থিক ব্যয় ভার বেড়ে গেল। একদিকে ব্রাহ্মধর্মের নিয়মকানুন, সাধনশৈলী রক্ষা করা—অপর দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার যুক্ত হওয়ায় অর্থকষ্টও শুরু হল। দুই দিক রক্ষা করা—মহর্ষিদেবের নিযুক্ত লোকজন, পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্রের আর্থিক দায়ভাগ বহন করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। তাই এঁদের আর রাখা সম্ভব হল না। আশ্রমের মালি হরিশের মতো পণ্ডিতমশাই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ শান্তিনিকেতন ছেড়ে বোলপুরে চলে আসেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রে সে কথা জানা যায়। তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখেছিলেন—

ওঁ

২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩ | 2970, Groveland Ave
Chicago

কল্যাণীয়েষু—

...তোমাদের বিদ্যালয়ের ভিৎও তোমরা টাকা দিয়ে গেঁথে তুলতে চাও। কিন্তু বিশ্বের নাড়ির যোগ রাখতে পারলে তবেই সত্যকার জীবনে এঁকে বাঁচাতে পারবে টাকার যোগে নয়। তোমরা সেই গরিবের ধন সেই সহজ আনন্দের পুষ্পমধুতে তোমাদের বিদ্যালয়টিকে ভর্তি করে রাখো। তোমাদের কার্পেট যদি না জোটে মাটির উপরে খুশি হয়ে বসো—খুশির চেয়ে নরম কার্পেট আর নেই। আমাদের শান্তিনিকেতনের যে কুঠরিতে সম্পত্তির দলিল এবং টাকার থলি আছে সেইখানেই আমাদের শান্তিঘটে ছিদ্র হয়েছে—সেইখান থেকেই আনন্দ সঞ্চয় শূন্য হয়ে যাচ্ছে—আমরা হরিশ মালী কিম্বা অচ্যুতানন্দ পণ্ডিতের মতো আমাদের আশ্রমদেবতাকে টাকা দিয়ে মাইনে করে রাখতে পারব এই কথা মন থেকে বিদায় করতে পারিনি বলেই তাঁকে বিদায় করছি—আমাদের আসবাব আয়োজন ঠেলে তিনি তাঁর আসনে এসে বসতে পারছেন না। আমাদের বিদ্যালয়ে তাঁর সেই পথ করে দাও, সেখানে তাঁর আসন বাধামুক্ত হোক—সেখানে তোমাদের ভক্তি তোমাদের নিষ্ঠা তোমাদের আনন্দ জয়যুক্ত হোক ;মাটির ঘটে তোমাদের মঙ্গলঘট স্থাপন করো—তার উপরে সোনার পাতা নয়, আম্রপল্লব সাজাও। শান্তিনিকেতনের ঐ বিদ্যালয়ের প্রান্তটিকে তোমরা গরিব করে দাঁড় করাও নইলে তাঁর কাছে সত্য মনে ভিক্ষা চাইবে কেমন করে? ধনের কালিমায় শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে অশুচি করেছে, আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ হবে তাকে ধুয়ে শুভ্র করে ফেলা—আমরা সেই সেবকের পদ গ্রহণ করব বলেই আশ্রমে এসেছি—আমরা কলঙ্কমোচন করব—অতএব টাকার

চিন্তা ত্যাগ করে পুণ্যতীর্থ জলের আয়োজন করো। ট্যাঁকশাল সে জলের গঙ্গোত্রী নয়, সে কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলো না।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

34655

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"[৩৫]

প্রাপ্ত চিঠিটি থেকে জানা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনের আদর্শগত পরিবর্তন এসেছিল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকেই। আশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানী ও গুণীজনের আগমন, বিভিন্ন কাজে অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে আশ্রমের প্রচণ্ড অর্থ কষ্ট শুরু হয়। সর্বোপরি মহর্ষিদেবের সময়ে যাঁরা এখানে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদেরও আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত মশাইকে আর রাখতে পারেন নি। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্রকে শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে চলে আসতে হয়েছিল বোলপুরে। বোলপুরেই তিনি গীতা ভাগবত কথকতার সঙ্গে সঙ্গে বোলপুরের ডাঙ্গালী কালীতলার পূজারও দায়িত্ব পান। সেই থেকেই মিশ্রপরিবার বোলপুরে থেকে গেছেন। আর সেই সঙ্গে পণ্ডিতমশাই-এর পরিবারের অতীত গৌরবের অধ্যায়টি স্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। এঁরা আজ এই মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণ পরিবার হিসাবেই সাধারণের কাছে পরিচিত।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ব্রহ্মসংগীত গায়ক শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য

শান্তিনিকেতনের মন্দিরে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও হবন করার জন্য আর্যসমাজের পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র মহাশয় নিযুক্ত হন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বা ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ। এরপর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরে গান করার জন্য শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে নিযুক্ত করা হয়। সুকন্ঠ শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য ছিলেন শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সর্পলেহনা গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তান। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর ধরে অর্থাৎ ১৮৯৮ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ব্রহ্মসংগীত গায়ক হিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আশ্রমবাসী হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে মহর্ষিদেবের প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত গায়ক শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য

শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের সর্পলেহনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মধর্মের আশ্রমে যোগদান করা সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা কঠিন। সমাজের কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙে তিনি চলে এসেছিলেন আশ্রমে। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত প্রাণ এই সৎ ব্রাহ্মণ শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য তাঁর আরব্ধ কর্ম করে গেছেন হাসিমুখে। সুন্দর কণ্ঠ—অন্তরের ভক্তিভাব নিয়ে সংগীত দিয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করে গেছেন। মাস মাইনের গায়ক হিসাবে নয়—হৃদয় দিয়ে ঈশ্বর অনুগত আত্মনিবেদনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পত্নী বিয়োগজনিত বিরহ বেদনা ও বিরাট শূন্যতায় একমাত্র পুত্র বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলেন। সঙ্গীতই তাঁকে ঈশ্বর অভিমুখী করে তুলেছিল। ব্রহ্মসংগীত ও ভক্তিগীতির সাধনায় সাধক হিসাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শ্যামশরণ সঙ্গীতে সিদ্ধ সহজ সরল মানুষ ছিলেন।

তবে সে যুগের প্রতিকূল সমাজের বেড়ি ভেঙে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরের গায়ক হিসাবে যোগদান করাটা ততটা সহজ ছিল না। কিন্তু মায়ের প্রেরণায় তিনি সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত সংগীত চর্চাও করে যেতেন। সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী শ্যামাশরণ বীরভূমের প্রচলিত কীর্তন, বাউল লোকসংগীত ভক্তিগীতি, রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা ও মঙ্গল-কাব্যের গানের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এইসব গান যেন বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ ও কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তখন বোলপুরে ছিল ধর্মসভা ও হরিসভার আলোচনা কেন্দ্র। বহু গুণীজন এখানে আসতেন। শান্তিনিকেতন থেকে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মসভায় যোগদান করতেন। আর বোলপুরের ব্যবসায়ী সারদাপ্রসাদ পাল মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল সর্পলেহনা গ্রামে। সারদাপ্রসাদ বাবু শ্যামাশরণকে ভালোভাবেই চিনতেন—তাঁর সুকণ্ঠ সম্বন্ধেও অবগত ছিলেন। ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্যামাশরণ ভট্টাচার্যের গান শুনে দ্বিপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীত হয়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে গায়ক হিসাবে নিযুক্তির ব্যবস্থা করেন। পিতামহ মহর্ষিদেব দ্বিপেন্দ্রনাথের নির্বাচনকে অনুমোদনও করেন। এরপরেই শ্যামাচরণ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরের গায়ক হিসাবে যোগদান করেন।

'প্রৈতি' পত্রিকার ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বিশেষ অনুষ্ঠানে মহর্ষিদেব ও দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সংগীত পরিবেশন উপলক্ষে Visva-Bharati News–August 1940 (Vol-IX No. II) -এ লেখা হয়েছে "He was a repository of many obsolete devotional songs composed by the Maharshi and Barodada and on especial occasions he used to sing them with a depth of feeling which recalled his long assoication with the two of our asrama's spiritual founders."

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর কথায় "শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতনে বহুকাল অবধি ছিলেন ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য রচয়িতার ব্রহ্মসংগীতের গায়ক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় সংগীতটি শ্যামাশরণ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শুনে আত্মস্থ হয়ে যেতেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে—

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে, শান্তি সদনে সাধন ধন দেব দেব হে।" গানটি তিনি বার বার শুনতেন।

শ্যামাশরণের কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো ও মধুর। তিনি ভাবের গভীরে প্রবেশ করে গাইতেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥"

এছাড়া "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয় রয়েছে গোপনে॥"—ইত্যাদি।

গান যখন তিনি গাইতেন তখন ব্রহ্মমন্দিরের পরিমণ্ডল স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করত। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর স্মৃতি কথায় এমনতর অনেক কথা জানা যায় শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রসংগীতাচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন—"ভট্টাচার্য মশায় খালি গলায় এমন গান করতেন যা অতুলনীয়। আমি ছিলাম গান পাগল, তাঁর কণ্ঠস্বরটি ছিল অত্যন্ত ভালো—সুরেলা। তাই দেখা হলেই কথা বলতাম ও সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে যেতাম। আমি তাঁর কাছে প্রসিদ্ধ গানটি শিখেছি—

"স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে, পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে, নবীন করে এ জীবনে হে
খুলি মোর গৃহদ্বার ডাক তোমারি ভবনে হে॥"

শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ও বলেছেন—"ভট্টাচার্য মশাই ব্রহ্মসংগীত বা পূজা পর্যায়ের গান গাইতেন। সেগুলির মধ্যে অবশ্যই ধ্রুপদ, ধামার বা খেয়াল ও টপ্পাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত ছিল। তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতই ছিল প্রধান। কীর্তন, বাউল প্রভৃতি গানও তিনি গাইতেন, তবে সাধারণত তা মন্দিরের বাইরেই তিনি গাইতেন।... শ্যামাশরণ বাবু যে সত্যিকারের রসিক ও মরমী গায়ক ছিলেন একথা স্বীকার করতেই হবে। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ও গায়ক হিসাবে তাঁকে পছন্দ করতেন বলেই মন্দিরে প্রতিদিন দুবেলা উপাসনার গান গাইবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল এবং নিরহংকারী ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও সাত্ত্বিক হলেও ছিলেন উদার মনোভাবের মানুষ। কোন সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। সেই কারণে আশ্রমের সকলেই তাঁকে পছন্দ করতেন। আর গুরুদেবেরও স্নেহের মানুষ ছিলেন।

ব্রহ্মমন্দিরের গায়ক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর মন্দিরের নিকটেই একটি ছোটো ঘরে তিনি থাকতেন। স্বপাক আহার করতেন, এবং নিরামিষভোজী ছিলেন। মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গান গাওয়াতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেও যেতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকাকালীন তাঁর গানের রেকর্ডও করা হয়েছিল বলে জানা যায়। ৭ই পৌষের বিশেষ দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানাতেন। জীবনে প্রথমে কুড়ি টাকা বেতনের গায়ক হিসাবে নিযুক্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেতন ৩০ টাকা করে দিয়েছিলেন।

এইভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে অসুস্থ হয়ে গ্রামের বাড়ি সর্পলেহনা গ্রামে চলে যান। সেখানেই ৬৯ বছর বয়সে দেহ রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালের বিশ্বভারতীর নিউজে তাঁর স্মরণে লেখা হয়—

"We regret to announce that Shamasharan Bhattacharja passed away peacefully on July 13 at the ripe age of 69 in his village home.

One of the earliest links of our asrama with its past has been snapped by his death. He was the oldest employee on our staff and had joined his work under the Santiniketan Trust towards the beginning of 1898. His forty two years of service and his clean unostentatious way of living endeared him to all of us in the asrama... We convey our deepest condolence to his only son Bimal Bhattacharja."[৩৬]

শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সময়েই আরও একজন গায়ক মন্দিরে গান করতেন। তাঁর নাম ছিল রসিকদাস বৈরাগ্য। রসিকদাসের বাড়ি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী কোনো গ্রামের মানুষ ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন রসিকদাসের বাড়ি ছিল সুরুল গ্রামে। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭) ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধানে জানা গেছে, রসিকদাস বৈরাগ্যের বাড়ি ছিল বোলপুর সন্নিকট বিখ্যাত 'সুপুর গ্রামে'। রসিকদাসের উত্তরপুরুষগণ সুরুলে চলে এসেছিলেন। এই রসিকদাসের বংশধর নারায়ণদাস বৈরাগ্য ও শ্রীধরদাস বৈরাগ্য বর্তমানে সুরুল গ্রামের বাসিন্দা ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন কর্মী। আমার অনুমান রসিকদাস প্রবীণ বয়সেই এখানে আসেন গান গাইবার জন্য। পরে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মহর্ষির শান্তিনিকেতনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে শ্যামাশরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একাই দুবেলা মন্দিরে গান গাইতেন।

শ্যামাশরণ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেশ কিছুদিন মন্দিরে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। এরপর মন্দিরে কিছুদিন গান গেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্র অন্ধ গায়ক কালু খাঁ। তিনি মারা গেলে মন্দিরে ব্রহ্মসংগীত গাওয়ার রীতিটি বন্ধ হয়ে যায়।

(দ্র. রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রৈতি পত্রিকা—২য় সংখ্যা—১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা

১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ বা ২১শে ডিসেম্বর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষিদেব কুড়িজন অনুরাগী সহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচারের প্রয়োজনে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর পলতার পরপারে গেরেটির বাগানে ব্রাহ্মবন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে তিনি মিলনমেলায় সকলের সঙ্গে মিলিত হন। সেই মিলনমেলাই অর্ধশতাব্দী পর মহর্ষির শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় রূপান্তরিত হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই পৌষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"পরদিন (৭ই পৌষ) প্রত্যুষেই প্রান্তরের নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়িল। সকলে একত্রে মিলিয়া বিনীতভাবে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে অট্টালিকা (শান্তিনিকেতন বাড়ি) হইতে মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেহালা হইতে আগত কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু মৃদঙ্গযোগে "প্রাণভরে আজ গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়" (শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত) গাহিতে গাহিতে অগ্রে চলিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিবা মাত্র কীর্তন থামিল।" (এরপর দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষির ট্রাস্টডীডের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে 'প্রতিষ্ঠাপত্র' পাঠ করেন) অনন্তর সকলে মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে অর্চনা পাঠ করিলেন। তৎপরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... প্রতিষ্ঠা কার্যের উপযোগী বক্তৃতা করিলেন। ... বেদীর পার্শ্বদেশ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। ... অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্যের উপসংহার করিলেন। ... শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত কার্যে যোগদান করিয়া উপাসকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।"[৩৭]

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর বৎসরে পৌষ উৎসবের দিন "প্রাতে পূজনীয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একাকী উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যাকালে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি করেন। তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্ব্বপ্রথম আতসবাজি প্রদর্শন করা হয়, এবং পঞ্চম বার্ষিকে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়। কএক বছরই ভক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর যাত্রার দল নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর দল এখানে কয়েকবার গান করে গেছে। অনেক উৎসবেই গুরুদেব গানের ভার নিয়েছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকলে দু একখানা গান একলাই গাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় উৎসবে কীর্তন করতেন এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণাকুমার সেন একবার খোল বাজিয়েছিলেন।

তখন উৎসবের সময় অনেক স্থান হতে উপাসক ও দর্শক আসতেন, মহর্ষিদেবের জোড়া-সাঁকোর বাড়ী হতে অনেকে আসতেন; আশ্রম সরগরম হয়ে উঠত। উৎকৃষ্ট রন্ধনকারী ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীরা আসত এবং আমাদের মহোৎসবের ব্যবস্থা করত।" 'শান্তিনিকেতনের কথা' গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মেলা প্রসঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রথম পৌষমেলার বিবরণ পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়—"সর্বপ্রথমে ঘণ্টারব। তখন সকলে ব্রহ্ম উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্তী করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। ... পরে আচার্যেরা বেদী গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... সকলকে উদ্বোধিত করলেন। পরে স্বাধ্যায়ন্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্ববক্তব্যের সহিত শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের

একটি হৃদয়স্পর্শী উপদেশ পাঠ করিলেন। ... পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মধুর গম্ভীর স্বরে ভক্তিভরে প্রার্থনা করিলেন।.. অনন্তর সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। মন্দিরের সোপান পরম্পরায় বহু সংখ্যক ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন—"অদ্য পৌষমাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতি কামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজ্য অনাথ, দীন, দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইল।" ... দিবা দ্বিতীয় প্রহর। চতুর্দিগে দোকান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয় লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ওই সময় সাধারণের হৃদয়ে সুশিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ তাঁহার সর্বস্ব দান স্ত্রী পুত্র বিক্রয়, সর্পদংশনে পুত্রের মৃত্যু, শ্মশানে পুনর্মিলন এই সমস্ত করুণরসোদ্দীপক গীতাভিনয়ে অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল। ...অনন্তর রক্তসন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল। বিচিত্র বর্ণের কাচ নির্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিল।" সন্ধ্যাকালীন উপাসনা উদ্বোধন করেন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, অন্যান্য আচার্যদের মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রমুখ। উপাসনার পর আতস বাজি। পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চট্‌চটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব পর্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহাকোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তৎকালে খধূপোদ্গাত গোলকের বিচিত্র নির্মল আলোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলই মস্তকরাজি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কী ভীষণ জনতা। কী বিষম কলরব।"[৩৮]

ভারতবর্ষের মেলাগুলি সাধারণত বিভিন্ন ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ বিশেষ পুণ্যতিথি, সাধুসন্তের আবির্ভাব তিরোভাব ও সিদ্ধিলাভ উপলক্ষেই মেলা বসে। সকলের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আর সমাজজীবনে মেলার প্রয়োজনীয়তাও অসাধারণ। ভারতের প্রাচীন পরম্পরার সূত্র ধরেই মহর্ষির সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের মেলার সূত্রপাত। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের দিন ৭ই পৌষকে স্মরণ করে ব্রাহ্মধর্মের সাধনরীতি মেনেই পৌষমেলার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে মেলা একদিন থেকে তিনদিনের রূপ নিয়েছে। বেড়েছে মেলার কলেবর অনুষ্ঠানাদি, এবং স্থানও পরিবর্তন হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। সর্বোপরি গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে শীতের অনুকূল আবহাওয়া, সাধারণ মানুষের হাতে আর্থিক সুযোগ থাকায় মেলার আকর্ষণই আলাদা। ১৪০১ বঙ্গাব্দে শতবর্ষের পৌষমেলার বিশেষ সংখ্যায় বিশ্বভারতী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন যা গবেষকগণের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

উপেক্ষিত অধ্যায়

শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রায়পুরের সিংহ পরিবারের অবদানের কথা স্বীকার না করলে আর ইতিহাস থাকে না। অথচ সেটিই ঘটে গেছে এখানকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবার উনিশ শতকের বঙ্গীয় শাসন ও সমাজব্যবস্থায় অভিজাত জমিদার পরিবার হিসাবে খ্যাত ছিল। জমিদারী পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর শাসনব্যবস্থায় শিল্প ও বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে যুক্ত হন তাঁরা। সুরুলের নীলকুঠির চীপ সাহেবের বাণিজ্য ও শিল্প কর্মে সিংহ পরিবার ও সুরুল গ্রামের জমিদার সরকার পরিবার যুক্ত হয়ে পড়েন। অজয় ময়ূরাক্ষী নদীপথে সেকালের বাণিজ্য বহর কলকাতায় চালান যেত। ফলে বাণিজ্য উপলক্ষে রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে কলকাতার অভিজাত সমাজের পরিচয় ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গেও এঁরা পরিচিত হয়ে ওঠেন। বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবার সে কারণেই শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এসব নানা কারণে রায়পুরের সিংহ পরিবার শুধু জমিদার নয়, তাঁরা বীরভূমের উন্নত রুচিশীল শিক্ষিত পরিবার হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব ইতিহাসের

মানদণ্ডে বিচার করলে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে রায়পুরের সিংহ পরিবারের অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সচেতনভাবে এই পরিবারের প্রতি কেন জানি না উপেক্ষার অচলায়তন আজও অপসারিত হয় নি। ফলে প্রশ্ন জাগে যাঁদের জমিদারীর এলাকাভুক্ত 'বিশ বিঘার শান্তিনিকেতন' আজ বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত, তাঁদের পরিবারের প্রসঙ্গে অধিকাংশ লেখকই কেন নীরব হয়েছিলেন? অথচ শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অবদানের কথা বলা বা লেখা হল না। বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ যাঁকে মহর্ষিদেব 'শান্তিনিকেতনের বুলবুল' বলতেন;শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে মহর্ষিদেবের হৃদয় বন্ধন ছিল গভীর, বয়সের কোনো ব্যবধান সে বন্ধনে কোনো বাধা হয়ে ওঠে নি। যে শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়িতে অবাধ প্রবেশ অধিকার ছিল, যে শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছবি হিসাবে সকলের কাছে সমাদৃত, যে শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের কণ্ঠে গান শুনে রবীন্দ্রনাথ গান শিখেছিলেন, যিনি তাঁর সংগীতের গুরু হিসাবে কবির কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, যাঁর পবিত্র চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে 'ঠাকুরদা' হিসাবে পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে—তিনি ছিলেন রায়পুরের সিংহ পরিবারের সন্তান। এই শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের উদ্যোগেই দুই পরিবারের সেতু রচিত হয়েছিল। এঁদেরই পরিবারের প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহর্ষির ব্রাহ্মশিষ্য হয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতন পাট্টা দিয়েছিলেন। এই সিংহ পরিবারের অন্যতম প্রাণপুরুষ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় শ্রীনিকেতনের 'কুঠিবাড়ি' বিক্রির টাকা সুদসহ ফেরৎ দিয়ে দশ হাজার টাকা রবীন্দ্রনাথকে দান করেছিলেন। এই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনিই ভারতের প্রথম ব্যক্তি যিনি লর্ড হিসাবে ব্রিটিশ শাসকের কাছে সম্মানিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে কাছে কাছে থেকেছেন ১৯২৫ সালে। আবার ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশনের সময় বিশ্বভারতীকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে সমগ্র পূর্বপল্লীর মাঠটিকে বিশ্বভারতীর অধিকারভুক্ত করে দেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রাপ্ত দশহাজার টাকা দিয়ে ১৯২৬ সালে কৃতজ্ঞতার সাক্ষী হিসাবে গৌরপ্রাঙ্গণে সিংহসদন নির্মাণ করিয়ে সে স্মৃতিকে রক্ষা করেছিলেন। অথচ ইতিহাস লেখার সময় কোন এক অদৃশ্য কারণে সেসব ঘটনাকে উপেক্ষাই করা হয়েছে। আমরা সেই উপেক্ষিত অধ্যায় নিয়ে আলোচনার প্রয়াসী এবং কতকগুলি সঙ্গত প্রশ্ন পাঠকের সমীপে উপস্থাপন করতে চাইছি।

(১) বীরভূমের রায়পুর থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় দেড়শত কিলোমিটার। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না—ছিল সময়সাপেক্ষ, তথাপি কেমন করে দুই পরিবারের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল? আর মহর্ষিদেব কেনই বা রায়পুরের সিংহ পরিবারের নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন?

(২) রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন ও ১৮ই চৈত্র রায়পুরে এসে কেন ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা ও সভা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?

(৩) ভুবনমোহন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কেন?

(৪) মহর্ষিদেবের আধ্যাত্মিক জীবনে রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন কেমন করে এবং কোন সূত্রে এটা ঘটেছিল? কেন মহর্ষি তাঁকে 'শান্তিনিকেতনের বুলবুল' বলতেন?

(৫) ঠাকুরবাড়ির অন্তরঙ্গ এবং রবীন্দ্রজীবনের স্মৃতিতে স্থান পেলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। আর 'ঠাকুরদা' চরিত্র হিসাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান লাভ, সংগীতশিক্ষার গুরু হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন কোন্ প্রেরণায়? (দ্রঃ জীবনস্মৃতি)

(৬) আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সন তারিখ উল্লেখ থাকলেও 'শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতন গৃহ' প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে কোনো সন তারিখের উল্লেখ না থাকার কারণ কী?

এইসব হাজারো প্রশ্ন করা যায় শান্তিনিকেতনের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে। আসলে যতই অনুসন্ধান করেছি ততই মনে হয়েছে রায়পুর থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটারের পথটুকু হারিয়ে গেছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মতো আমরা কী প্রশ্ন করতে পারি "পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবারের যোগসূত্রের প্রসঙ্গে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে গেছেন। মহর্ষিদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কেও মহর্ষিদেব লিখেছিলেন ১৮৫৮ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে যে "তুমি শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে—বীরভূমবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরস আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।" অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন—"কী ঘটনা সূত্রে এবং কোন সময়ে কোথায় এই পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহর্ষির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। ... আমরা শুনিয়াছি প্রতাপবাবু মহর্ষিদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি প্রতাপবাবুর মুখে মহর্ষিদেবকে 'গুরুজি' বলিয়া উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। প্রতাপবাবুর লিখিত পত্র আমার নিকট আছে তাহাতে মহর্ষি 'গুরুদেব' ও 'গুরুজি' এই রূপ উল্লেখ আছে। ইহাদের সহিত মহর্ষিদেবের পরিচয় যে ১৭৮০ শক অর্থাৎ ১২৬৫ সালের অনেক পূর্বের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[৩১]

অতএব অঘোরনাথের তথ্যানুযায়ী ১২৬৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের অনেক আগেই দুই পরিবারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রশ্ন—অনেক আগে থেকে বলতে কতদিন আগে থেকে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল? সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলে তবেই প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে। হঠাৎ করে মহর্ষিদেব সিংহ পরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ছাতিমতলায় সরাসরি পৌঁছে গেলেন আর সব কিছু ঘটে গেল বলে তো শেষ সিদ্ধান্ত করা যায় না। একটা যোগসূত্র—তার পরম্পরা ধরেই সব কিছু ঘটে। তাই যোগসূত্র যে ছিল সেটা অঘোরনাথ জানিয়েছেন—কিন্তু কোনো তথ্যাদি এ যাবৎ তেমন কিছু পাওয়া যায় নি।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় মহর্ষিদেব রায়পুরের ভুবনবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন—এটি প্রচলিত মত। তবে ভুবনবাবুর নিমন্ত্রণেই মহর্ষিদেব রায়পুরের বাড়িতে এসে থাকলে পাট্টাগ্রহণের পত্রে তাঁর স্বাক্ষর থাকত। এতবড় পুণ্যকর্মে ভুবনবাবু থাকলেন না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ পাট্টাপত্রে প্রতাপনারায়ণ মহর্ষির পদবন্দনা করেই পাট্টা দিয়েছিলেন—যা প্রচলিত পাট্টাপত্রের শৈলীর সঙ্গে মেলে না। অতএব এটা সঙ্গত যে মহর্ষিদেবের রায়পুরে আসার আগেই ভুবনবাবু দেহ রাখেন।

মহর্ষিদেবের আত্মচরিত থেকে জানা যায় "ঈশ্বরের আদেশ বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়া ইহাই ধারণা হইল। ১৭৮০ শকাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ ৪১ বৎসর বয়সে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।" মহর্ষিদেব ১৭৭৮ শকাব্দের ১২ আশ্বিন থেকে ১৭৮০ শকাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ এর মধ্যে দুবছর হিমালয়ে ছিলেন অর্থাৎ ১৮৫৬-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখেছিলেন ১৭৮০ শকাব্দ বা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের শ্রাবণ মাসে বা ২৭শে জুলাই যে প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সময়কাল ১৭৭৮ শকাব্দ বা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ আশ্বিনের আগে ছিল তাতে সন্দেহ নাই। অতএব ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি

দুটি পরিবারের ঘনিষ্ঠতা না থাকলে প্রতাপনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতেন না। তাছাড়া অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন "কী ঘটনাসূত্রে এবং কোন সময়ে এই পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে অসম্ভব।"

এখন বোঝা যায় দুই পরিবারের সম্পর্ক কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়—কোথাও একটা যোগসূত্র ছিল। রায়পুরের সিংহ পরিবারের কথা হল কোনো এক মামলা মকদ্দমা সূত্রে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এমত তাঁরা শুনে আসছেন বংশ পরম্পরায়।

বিশ্বভারতীর বাংলা পুথিঘরে সুরুল সরকার জমিদার পরিবারের প্রচুর নথিপত্র সংগৃহীত হয়। এগুলি বর্তমানে লিপিকায় স্থান পেয়েছে। তৎকালীন বাংলা বিভাগের প্রধান এবং আমার পূজনীয় অধ্যাপক স্বর্গীয় ভূদেব চৌধুরী মহাশয় আমাকে নথিপত্রগুলিকে সংকলন করে প্রকাশের নির্দেশ দেন। দুষ্পাঠ্য ও দুরূহ পাঠ এসব নথিপত্রগুলি উদ্ধার করে বহু আয়াসে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'সুরুল নথি সংকলন', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি প্রকাশ করেন।

নথিপত্রগুলি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা আমার নজরে আসে। এতে দেখা যায় সুরুলের জন চীপ সাহেবের নীলকুঠিতে কারবারে যুক্ত হয়েছিলেন সুরুলের সরকার জমিদার পরিবার এবং রায়পুরের সিংহ পরিবার। এঁদের কাজ ছিল নীল, চিনি, গড়াকাপড় ইত্যাদি উৎপাদন ও কলকাতা বন্দরে বহির্বাণিজ্যের জন্য রপ্তানী করা। বীরভূমের অনেক সম্পন্ন পরিবারও এসব কারবারে যুক্ত হয়ে পড়েন। সুরুলের সরকার পরিবারের রামনারায়ণ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র আশানন্দ সরকার পারিবারিক পরম্পরা অনুসারে গড়াকাপড়, চিনি, নীল ইত্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানি কর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কাজে তিনি ১২৩১ বঙ্গাব্দে বা ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই বৈশাখ রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট ১০ (দশ) হাজার টাকা কর্জ গ্রহণ করেন। দফায় দফায় ১২৩৬ সালের চৈত্রমাস নাগাদ (১৮২৯ খ্রিঃ) ৭৪৯৭ টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু বাকি ২৫০৩ টাকা তার সুদ ও ১২৩৮ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ নাগাদ 'ওয়াশিলের হেফাসবন্দীসুরত" ৩৭৮৪ টাকা সাত আনা দু পয়সা এবং আসল সুদের বাকি সহ সর্বমোট ৬১৪৭ টাকা সাত আনা দু পয়সা আদায়ের দাবিতে ভুবনবাবুর তরফে আশানন্দ সরকারের বিরুদ্ধে সিউড়ির আদালতে নালিশ রুজু হয়। এই মকদ্দমার নম্বর হল ৪৬৪। সিউড়ী আদালতে আশানন্দ সরকারের পরাজয় ঘটে।

পরাজিত আশানন্দ সরকার কলকাতার উচ্চ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেন। 'রেটরী সাহেবের' এজলাসে মকদ্দমা শুরু হয়। সুরুলের তরফে কলকাতায় যাঁরা মামলা তদবির ও সওয়াল করতেন তাঁরা হলেন মোক্তার পরেশনাথ শর্মা, দীননাথ সরকার ও দৈবকীনন্দন দাস। অন্যদিকে রায়পুরের তরফে মামলার সওাল ও তদবির করতেন ভুবনমোহন সিংহের ভাইপো (তরফছানির ভ্যাতষপুত্র) নীলকণ্ঠ সিংহ, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, পবন ঘোষাল ও রাধামোহন মিত্র। সুরুলের আশানন্দের পক্ষে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। "রাইপুর নিবাসীরা ডিক্রি জারি করিতে উদ্দত" হওয়ায় আশানন্দের তরফে "প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দী দিগরের মোক্তারের" সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। ফলে রায়পুর নিবাসী ভুবনমোহন বাবু ডিক্রি পেলে টাকা আদায়ের জন্য আশানন্দের অংশ তিন আনা চার গণ্ডা জমিদারী লাট কৃষ্ণনগর ওরফে সুরুল, লাট নোহনা ও লাট কোপার অংশ বিক্রির আদেশ জারি হয়।[৪০]

কিন্তু ডিক্রি জারি হওয়ার পরও সুরুলের তরফে পুনরায় আপিল করা হয় সিউড়ী আদালতে। নিলাম স্থগিতের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১২৪২ বঙ্গাব্দ বা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের ডেপুটি কালেকটর মহাশয়কে শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের পক্ষে "ইলামবাজারবাসী জান আস্কীন সাহেবের সুপারিশীতে" সন ১২৪৪ সালের ২৪ ভাদ্র (১৮৩৬ খ্রিঃ) আশানন্দ সরকারের ঐ জমিদারী

নিলামের ব্যবস্থা করা হয়। সেই মতো "সন ১৮৩৮ সালের ৪ঠা জুলাই ১২৪৫ সাল তারিখ ২৪ রোজ দুই প্রহরের পর জেলা [বীরভূমের] কালেকটরি কাছারি প্রকাশ স্থানে নিচের তপশীল মত নিলাম [বিক্রী] হইল।" ঐ জমিদারীর তিন আনা চার গণ্ডা অংশে ক্রয় করেন যথাক্রমে লাট কৃষ্ণনগর [সুরুল] অংশের "খরিদার- শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায় ওলদে ˚গঙ্গাধর রায় সাং যুপুর তালুক যুপুর জেলা বীরভূম। শ্রীকণ্ঠ সিংহ ওলদে ˚মনমোহন সীংহ সাং রাইপুর তালুক ও জেলা ঐ। লাট কোপার তিন আনা চার গণ্ডা অংশে ক্রয় করেন শ্রীয়জিত সীংহ রায় ওলদে ˚বংসীধর রায় সাং দিম্রনগর পরগণে গোপভূম জেলা জঙ্গলমহল। লাট নোহনার তিন আনা চার গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন শ্রীয়জিত সীংহ রায় ওলদে ˚বংসীধর রায় সাং দিম্রনগর পরগণে গোপভূম জেলা জঙ্গলমহল। মকাবিলায় শ্রীসীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাফেজ।"[৪১]

এই মকদ্দমা প্রসঙ্গে মোক্তারদের লেখা পত্রাদিগুলি বেশ চমকপ্রদ। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্যের পাশাপাশি মানুষের সমাজজীবনের চলমান স্রোতের সুখ দুঃখের অভিব্যক্তি চিত্তাকর্ষক। পাঠক-গবেষকগণ এগুলি থেকে অনেক উপকরণ পেতে পারেন। কয়েকটি নমুনা দিয়ে নথিগুলির উপস্থাপন করছি।

(১) "... রাইপুর নিবাসির্দ্দের মোকদ্দমা ডিগিরি হইয়াছে শুনিয়া জেতক দুক্ষিত হইলাম তা পত্রে কি লিখিব... জামিনি জন্নে উদবিঘ্ন হইবেন্না কিছু খরচ জেয়েদা হইবেক আন্দাজ হয় জামিনি নিমিত্তক আটক হইবেক না শ্রীযুৎ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুৎ রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দীদিগের মোক্তারকে লইয়া তদবির করাতে বুঝায় জামিন হইবেক মোক্তার সিকার হইয়াছে কিন্তু ফয়সালা না দেখিয়া জামিনি হইবেক না ... ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ১৯ ভাদ্র।"

(২) " ... ১১ দফা রাইপুর নিবাসিদের মোক্তার শ্রীযুৎ পবন ঘোষাল আসিয়া শ্রীরাধামোহন মিত্রের বাসায় বাসা করিয়াছেন এবং ওই মিত্রির সহিৎ শলা পরামর্শ করিতেছেন।"

(৩) "... তরফছানির ভ্যাতষপুত্র শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও ঘোষাল ও রাধামোহন মিত্রির লোক সমিভার পাঁচ সাতজনা দোসালা গাএ উড়াইয়া মিছিলের ওক্তে হুজুরে হাজির হইয়াছিলেন বার্ক্ক প্রওগ করিতে দিই নাই।"

(৪) "... রাইপুর নিবাসিরা অধিক টাকা খরচ করিতে উদ্দত আছে জনরব শুনা যাইতেছে।"

(৫) "... পূর্ব্বে তদবির করিয়া আমলার নিকট না যাইয়া দুই সও টাকা স্তির করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীকণ্ঠ সিংহ আসিয়া আমলার সহিত তদবির করাতে আমি সেই খপর শুনিয়া আমলার নিকট এক সও টাকা ধাজ্য করিয়া একুনে তিন সও ছয় টাকার নোট লিখিয়া দিয়াছি..."।

(৬) "... পুনছ নিবেদন শ্রীকণ্ট সিংহ কল্য তারিখে বাটী গিয়াছেন এখানে ঘোষাল মজকুরকে রাখিয়াছেন।"

(৭) "... আর কলিকাতার মকর্দ্দমা খরচ করিতে পারিলে হক না হক হয় আর না হক হক হয় ইহা খুব আপনি জানিবেন আর ঐ সাহেবের যে য়াত্তিয়লোক তাহার নিকট গিয়াছিলাম তিহ আশ্বাষ করিয়াছেন কল্ল মঞ্জুরে দুই সও টাকা চাহে...।"

পত্রগুলি মোক্তার পরেশনাথ শর্মা আশানন্দ সরকার মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন । মোক্তার দৈবকীনন্দন দাসও পত্রাদি লিখেছেন। তিনি একটি পত্রে অনেক কিছু বলার পর পরও লিখেছেন—

(৮) "... জে পত্র আদি লিখিবেন তাহার ঠিকানা মোং কলিকাতার বাকবাজারের ˚মদনমোহন ঠাকুরের উত্তর শ্রীযুৎ চৈতন্যচরণ ঘোষের বাটীতে আমার বাসা জানিবেন।"[৪২]

পত্রগুলিতে মানব সমাজের ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন 'মানিলটারী' চিঠিপাঠানোর জন্য সরকারি ডাক বিভাগকে অগ্রিম মাশুল প্রদান করা নচেৎ "বেরং" হলে বেশি মাশুল দিতে হতো। ১২৪০ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'মাড়িভয়" অর্থাৎ মহামারি হয়েছিল—সেজন্য অনেকেই কলকাতা ত্যাগও করেছিলেন। সুরুলের আশানন্দ সরকারের লোক 'রামপ্রসাদ সীংহকে' চলে আসতে হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহের ৪৬৪ নম্বরের রুজু মামলাটি সিউড়ী থেকে কলকাতার উচ্চ আদালতের "রেটরী সাহেবের" এজলাসে স্থানান্তরিত হবার পরই উভয় পক্ষের লোকজন কলকাতায় থেকেছেন এবং আইনজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে নানা পথে অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এক কথায় সুরুলের পক্ষ থেকে কয়েকজন মোক্তার মামলা দেখাশুনা করতেন—অন্যদিকে রায়পুরের ভুবনবাবুর পক্ষে তাঁর ভ্রাতা মনমোহন সিংহের পুত্ররা বিশেষ করে নীলকণ্ঠ সিংহ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রত্যক্ষভাবে এই মামলায় তদবির, সওয়াল জবাব, কলকাতার আইনজ্ঞ মোক্তারাদির সাহায্য নিয়ে জয়লাভ করেন। অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই রায়পুরের নীলকণ্ঠ সিংহ, শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও রাধামোহন মিত্রের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কলকাতার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন মহর্ষির শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্ত রচনায় এ জাতীয় মামলার অবতারণার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? আমরা জানি এ মামলার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্তের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নাই। শান্তিনিকেতনে নিছক সাধনক্ষেত্র হিসাবেই মহর্ষিদেব এসেছিলেন। কোনো বৈষয়িক কারণ এর মধ্যে আসতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখাতে চেয়েছি যে দুটি পরিবারের যোগাযোগ কী কারণে ও কোন্ ঘটনার সূত্রে ঘটেছিল। এ নিয়ে পূর্বাপর মহাজনেরা নীরব থেকেছেন শুধু স্বীকার করেছেন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সিংহ পরিবারের সম্পর্ক অনেক আগে থেকেই ছিল। সেই সম্পর্ক স্থাপনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুই পরিবারের বিরোধ ও মামলা মকদ্দমার ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে চেয়েছি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীতেও দেখা যায় সেকালের কলকাতার বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি আইন বিষয়ে ফার্গুসন সাহেবের নিকট যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বীরভূম ও এতদ্ অঞ্চলের বহু জমিদার পরিবারকে আইনি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এঁরা তাঁর কাছে যেতেন—তিনি 'লিগাল এজেন্ট' হিসাবেও কাজ করতেন। "আইন পরামর্শদাতা হিসাবে দ্বারকানাথ কয়েকজন রাজা ও জমিদারদের আস্থা ভাজন হন।" "এমন কি বড় বড় জমিদারদের প্রচুর অর্থ কর্জও দিতেন।" (দ্রঃ J. H. Hughes, Attorney to Dwarakanath Tagore–1830-January)

আমাদের অনুমান সিংহ পরিবার এই মকদ্দমায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনি সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছিলেন। যেমন সুরুলের তরফে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দীদের মোক্তারের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল তেমনি রায়পুরের পক্ষে রাধামোহন মিত্র মহাশয় এ কাজটি করেছিলেন। পরে শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় রাধামোহন মিত্র মহাশয়ের মাধ্যমেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

সুরুল নথিপত্রে এই মামলা মকদ্দমায় রাধামোহন মিত্র মহাশয়ের নাম পাওয়া গেছে। তিনি কলকাতায় থাকতেন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ ও পরবর্তী সময়কালে। অন্যদিকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাস বা ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্রাহ্মধর্মের শিষ্য প্রতাপনারায়ণের নিকট কুড়ি বিঘার শান্তিনিকেতন পাট্টা গ্রহণ করেছিলেন তখন 'ইসাদী' বা সাক্ষী হিসাবে রাধামোহন মিত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। রাধামোহন মিত্র মহাশয়ের পরিচয় যেটুকু জানা যায় তা হল তাঁর স্থায়ী নিবাস ছিল 'সাকিম-মহুরাপুর'। তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা ছিল 'মোকাম রায়পুর'। আমাদের

অনুমান এই রাধামোহন মিত্র এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাধামোহন মিত্র যিনি মামলা মকদ্দমা পরিচালনার ক্ষেত্রে যখন কলকাতায় থেকেছিলেন তিনি একই ব্যক্তি। মহর্ষিকে স্থানটি পাট্টা দেওয়ার মহৎকর্মে তিনি সাক্ষী থেকেছিলেন। এছাড়া পাট্টাপত্রে আরও একজন সাক্ষী ছিলেন—তিনি হলেন রামেশ্বর লাহিড়ী। তাঁর স্থায়ী নিবাস ছিল শান্তিপুর এবং মোকাম রায়পুর। এই রামেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ের পরিচয় জানা গেলে শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গে সম্ভবত আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

মহর্ষিদেব ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের এই পৌষ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন। অপরদিকে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনি শুনেছিলেন প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহর্ষির তত্ত্বাবধানে থেকে কলকাতায় পড়াশুনা করেছিলেন। রায়পুরের সিংহ পরিবারের বংশাবলী থেকে জানা যায় "ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ 'Library Examination' পাশ করিয়া বঙ্কিমবাবুর সমসাময়িক কালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন।" প্রতাপনারায়ণ সিংহ যে কলকাতায় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজে যোগদান করা থেকেই। প্রতাপনারায়ণ সিংহ আইনজ্ঞ এবং বিচারক ছিলেন। এই জন্য অঘোরবাবুর তথ্যটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আর মহর্ষিদেবের সান্নিধ্যে কলকাতায় থেকেছিলেন বলেই উচ্চশিক্ষিত প্রতাপনারায়ণ সিংহ যুবক বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এটা বিশ্বাসযোগ্য। এইসব ঘটনার পরম্পরা সূত্রেই বলা যেতে পারে দুটি পরিবারের এত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হওয়ার মূলে নিশ্চয়ই আলোচ্য মামলা মকদ্দমার কাহিনীটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। আরম্ভের আরম্ভ হিসাবেই আমরা নথিপত্রের সূত্রটি উপস্থাপন করেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রায়পুর আগমন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রায়পুরের সিংহ পরিবারে আগমন কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। তিনি তাঁর শিষ্য প্রতাপনারায়ণ সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন। অথচ মহর্ষির রায়পুরে আগমন অপেক্ষা শান্তিনিকেতনে আসা বা আবিষ্কারের কথা, পথঘাট নিয়েই বেশি করে আলোকপাত করা হয়েছে। সেকালের কলকাতার সঙ্গে বীরভূমের যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকটি প্রায় গৌণ হয়ে গেছে। আমরা এই বিতর্কিত বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি—তাই ইতিহাসের বাস্তবতা থেকেই এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বীরভূমে বিদেশি শাসনব্যবস্থা ক্রমশ স্থায়ী হবার পর কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ মূলত স্থল ও জলপথেই হয়ে থাকত। বীরভূমে কোম্পানি রাজত্বে চিনি, নীল গড়া কাপড় ইত্যাদি উৎপাদন ও কলকাতা বন্দর দিয়ে তা বিদেশে চালান যেত। এ জন্য ফরাসি কুঠিয়াল থেকে শুরু করে ইংরেজ কুঠিয়ালেরা এখানে কুঠিবাড়ি নির্মাণ করেন। কোম্পানির কারবারে বীরভূমের জমিদার সম্প্রদায় ও অভিজাত পরিবার এ কাজে যুক্ত হয়ে কাজ করতেন। সুরুলের সরকার জমিদার পরিবার ও রায়পুরের সিংহ পরিবার এ কাজে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সময়ে সুরুলের কুঠিবাড়ি ও গুনুটীয়ার নীলকুঠি ইতিহাস খ্যাত ছিল। জন চীপ সাহেবের সুরুলের কুঠিবাড়ির উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী অজয় নদ ও ময়ূরাক্ষী নদীপথে কলকাতায় পাঠানো হত। এ জন্য পথঘাট নির্মাণ করা, নৌ পরিবহনাদির ব্যবস্থা করা হয়। অতএব জলপথ ছিল সেকালের কলকাতায় যাতায়াতের মাধ্যম। এছাড়া স্থলপথেও বোলপুর গুসকরা বর্ধমান হয়েও কলকাতা যাতায়াত চলত।

বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির গুরুত্ব পায় ব্রিটিশ প্রশাসকদের

কাছে। সেজন্য বিদ্রোহ দমন করা ও এতদঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী কলকাতার যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনে রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। ফলে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর অজয় রেলসেতু নির্মিত হয়। এর পরে পরে ছোট ছোট নদীগুলির সেতু নির্মাণ করে ধীরে ধীরে বীরভূমের সঙ্গে কলকাতার যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

মহর্ষিদেবের রায়পুর আগমনের পথনির্দেশিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অঘোরনাথের লেখার মধ্যে। তিনি লিখেছেন "রায়পুর আসার আগে মহর্ষিদেব গুসকরায় তাঁবুতে বাস করে গিয়েছিলেন। তিনি নির্জন স্থান খুঁজছিলেন। অল্পদিনের ব্যবধানে তিনি দু'বার রায়পুরে আগমন করেন এবং তার পরে এ জায়গা পাট্টা নেওয়া হয়।"

অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন—"গত শতাব্দের মধ্যভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'সখা ও শিষ্য' মহাতাবচন্দের রাজবাটীতে বর্ধমানে ঘন ঘন আগমন করতেন কখনো রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে, কখনও এককভাবে। মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি সে সময়ে 'তান্ত্রিক সাধকদের মত' সাধনার জন্য নির্জন স্থান অন্বেষণ করেছিলেন। মহাতাবচন্দ্র অনুরুদ্ধ হয়ে মহর্ষিকে গুস্করার চোঙ্গদার মহাশয়গণের রমণাথান' নির্দেশ করে গুস্করায় আগমন করার পরামর্শ দান করেন।

সুরুল নথিতে (অপ্রকাশিত) আমরা এইদিকে রেলপথ বসানোর সন তারিখ পেয়েছি। রেলওয়ে কমিশনের কমিশনারের পত্রে জমি অধিগ্রহণের নোটিসে সন তারিখ আছে তা থেকে বোঝা যায় তখন এদিকে গুসকরা পর্যন্ত রেলপথ বসেনি। বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে পালকিতে করে সোজা সড়কপথে এসে মহর্ষির তাঁবু পড়তে লাগল গুস্করার রমণার আমবাগানে। চোঙ্গদার মহাশয়গণের সৌধস্থিত পালকিশালায় সম্ভবত ষোলো কাহারের সে পালকির নিদর্শন এখনও রক্ষিত আছে।

পঞ্চমুণ্ডির সাধক তারাপ্রসন্ন চোঙ্গদার তখন গুসকরার রাজা। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে সাদরে বরণ করেছিলেন। সব কিছুর সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। তারাপ্রসন্নের এখন (১৯৮৪) চতুর্থ পুরুষ বর্তমান। চোঙ্গদার বাড়ির দেবনাথ ও গৌতমের বিবৃতি (২/৬/১৯৮৪) মতে, মহর্ষির 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' স্থাপনার পরিকল্পনা ও সূচনা হয়েছিল গুস্করাতেই। এই কথাটা তখন অনেকেই জানতেন। খাস বর্ধমান শহরেও মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দের 'রমণার বাগান' ছিল। এখনও বর্তমান আছে। অনুমান হয়, তান্ত্রিক সাধনার কোন আয়োজন তখন ওখানে ছিল না। পরে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ওখানে 'বিহার' প্রতিষ্ঠা করে স্থানটিকে জৈনরূপ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

গুস্করায় 'রমণাথানের' উত্তরদিকে প্রশস্ত নদী আর দক্ষিণ দিকে বড়ো বড়ো সরোবরের সংকীর্ণ পরিবেশে মহর্ষির ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের ফলে,. শেষ পর্যন্ত 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' বর্ধমানে বা গুস্করায় রমনার পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হলো না। পরে রায়পুরের রবি সিংহের 'হাটপুকুরের বাগানে' মহর্ষির আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়েছিল। ওখানে 'বামাক্ষেপার পঞ্চমুণ্ডী আসন' ছিল। কিন্তু ওখানে হয় নি। শেষ পর্যন্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলো বোলপুরের ভুবনডাঙ্গার প্রান্তরে।"[৪৩]

প্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে জানা যাচ্ছে মহর্ষিদেব বর্ধমান রাজবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে গুস্করায় এসেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে বীরভূমের অজয় উপত্যকার রায়পুর গ্রামে শিষ্য প্রতাপনারায়ণ সিংহদের বাড়ি এসেছিলেন—তাঁর এখানে আসাটার পিছনে সিংহ পরিবারের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। ফলে মহর্ষিদেব সিংহ পরিবারের নিমন্ত্রিত হয়ে যখন এসেছিলেন তখন তাঁদের যাতায়াতের নির্দিষ্ট পথেই তিনি রায়পুরে আসেন। পরে রেলপথ চালু হলে তিনি বোলপুর-শান্তিনিকেতন ও রায়পুরে রেলপথেই এসেছেন।

অতএব বলা যায় মহর্ষিদেব শান্তিনিকেতনে আসার আগে রায়পুরেই এসেছিলেন—সেখানে সিংহ পরিবারে সসম্মানে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর রায়পুর আগমন গুসকরার পথেই এবং সিংহরাই তাঁকে রায়পুরে নিয়ে এসেছিলেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন।

রায়পুরের সিংহ পরিবারের চকমিলান দালান কোঠার দোতলায় তাঁর জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর ছিল। সেটি বর্তমানে ভগ্নদশায় অতীতের স্মৃতি বহন করছে। মহর্ষিদেবের নির্দিষ্ট কক্ষের পাশেই তাঁর শিষ্য প্রতাপনারায়ণ থাকতেন—সেটিও অনুরূপ অবস্থায় রয়েছে। প্রতাপনারায়ণের কক্ষে তাঁর স্বহস্ত লিখিত ব্রাহ্মধর্মের ও ঈশ্বরীয় বিষয়ক বাণীগুলি লিখিত আছে। যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে তা হল—"তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল, তুমি... তুমি আদি, তুমি অনন্ত, তুমি জ্যোতি স্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা, তুমি নিত্য, তুমি পূর্ণ, তুমি পরম, তুমি অমৃত সেতু, তুমি অগম্য অপারাবার, প্রপঞ্চয়াতীত অনাদি অন্ত অরুণ, তুমি... মূলাধার।

...প্রেম মুখ দেখবে তাহার .... সত্য স্বরূপ সুন্দর .... যায়, শোক যায়, তাপ যায়, হৃদয় ভার সর্ব সম্পৎ তাহে মেলে যখন যা ... না থাকে সন্ধ্যায় তাপ চলে ছায়া দান সকল সময়ে বন্ধু, তিনি এক ... প্রাণ ছাড়ি জদি অনাদি পথে ... স্মরণে হয় আনন্দ ভবসেতু ...।

প্রতাপনারায়ণ সিংহ"[৪৪]

মহর্ষিদেবের শিষ্য
প্রতাপনারায়ণ সিংহ

রায়পুরের সিংহ পরিবারে মহর্ষিদেবের ব্রহ্মোপাসনা

১৭৮৩ শকাব্দের বা ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"বীরভূমের শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সিংহ মহোদয়ের বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা ১৮ চৈত্র ১৭৮৩ শক।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদীতে আসীন হইয়া আদেশ করিলেন যে,

আমরা পুনর্ব্বার এখানে উপাসনার নিমিত্তে সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। কেমন তাঁর করুণা, আমরা একমাস পূর্ব্বে এখানে সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে পূজোপহার প্রদান করিয়াছি;আবার অদ্য সেই স্নেহময় পিতার নাম এখানে প্রতিধ্বনিত হইবে। আমরা এখনো জানি না যে তাঁর কত করুণাবারি আসিয়া অদ্য আমারদিগকে সিক্ত করিবে। যেমন বর্ষাকালে তাঁহার করুণাবারি একবার বর্ষিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁর কৃপা আসিয়া যে গৃহে পতিত হয়, তাহা একবার পড়িয়াই নিরস্ত হয় না, কিন্তু বারবার সেই গৃহকে অমৃত সলিলে সিক্ত করে। অদ্য তাঁর করুণা পুনর্ব্বার আমারদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে; আমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছি, আমারদিগের মনের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ধ্বনিই উপাসনারূপে ঈশ্বরের চরণে সমুত্থিত হইতেছে। অদ্যকার এই রজনীর সমাগমে তাঁরই জ্যোতি—তাঁরই আলোক প্রকাশ পাইতেছে;কিন্তু আমারদের চর্ম্মচক্ষুতে তাহা প্রকাশ পায় না। এ চর্ম্মচক্ষুর এমন কি মহত্ত্ব, কি মর্যাদা যে সেই জ্ঞানজ্যোতিকে দর্শন করে, এ চক্ষুর এমন কি ক্ষমতা যে সেই চক্ষুর চক্ষুকে গ্রহণ করে। তবে কে গ্রহণ করিতে পারে? না আমারদের এই জ্ঞানচক্ষু, ইহার দ্বারা আমরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই দর্শন করি—অদ্যই আমারদের হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আমরা এখনি তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য ধন্য হইতেছি। তোমরা সকলেই মনকে সমাহিত করিয়া তাঁহার করুণা অনুভব কর দেখিবে যে জ্ঞানচক্ষুতে সেই জ্ঞান স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হৃদয়ে তাঁর মঙ্গলমূর্তি প্রত্যক্ষ কর, তাঁর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছাকে সম্মিলিত কর, যাহা বুঝিতে পার নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে, হৃদয় প্রশস্ত হইবে, দ্বেষ, কলহ বিদূরিত হইবে, সৌভাগ্য সমীরণ বহমান হইবে। তাঁহার এই প্রকার করুণা আমার নিকটে উপলব্ধ হইতেছে। হে সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা

হৃদয়াধারের প্রতি হৃদয়কে সমুন্নত কর; তোমারদের মন, তোমারদের চক্ষু, তোমারদের হস্ত তাঁহার প্রতি উত্তোলন কর; সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর—ত্রিভুবননাথের গান কর।

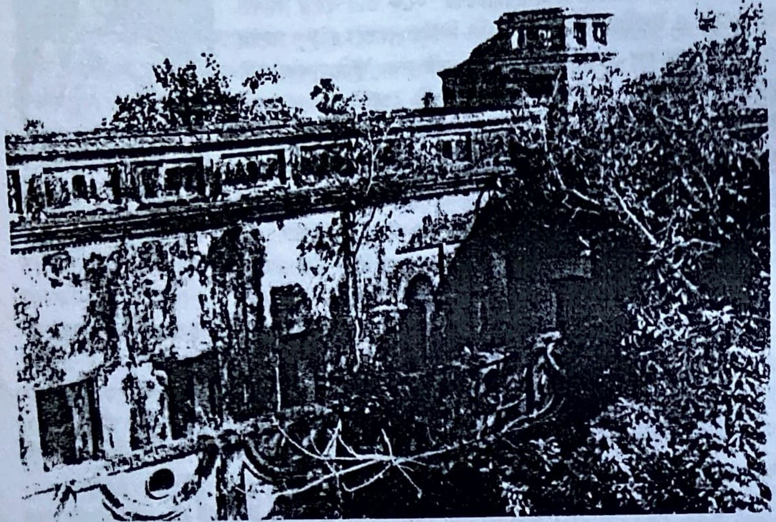

বীরভূমের রায়পুরে সিংহপরিবারের ভগ্ন দালান কোঠা

"রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল

হে। ত্রিভুবননাথ। স্মরণে হয় আনন্দ। ভবসেতু ধর; পরম কারণ।
জগন্নাথ, জগদীশ, জগতগুরু, জগজনহিত কারণ, হে পাবন ভক্তবৎসল ভবতারণ।
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, পতি সুরপতি, অতি জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপ ;
তব প্রতাপ কোথায় না হয় স্মরণ সর্ব্বলোক প্রতিপালন।।"

তৎপরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল এবং তাহার শেষে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্যাখ্যান করিলেন যে—

"তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যারি জন্ম, তারি মৃত্যু ; যারি বৃদ্ধি, তারি ক্ষয়, সংসার কেবল পরিবর্ত্তনের আলয়।... এখনই আমারদের সকলের মনকে তোমার দিকে লইয়া যাও। এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"[৪৫]

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"১২৬৮ সালের ১৮ই চৈত্র তারিখে মহর্ষিদেব ভুবনবাবুর বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনায় তিনি যে বক্তৃতা দেন ও সঙ্গীত হয় তাহা একখণ্ড পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

"বীরভূমের রায়পুর নিবাসী বিখ্যাত গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সিংহ মহোদয়ের গৃহে ১৭৮৩ শকের চৈত্র মাসের অষ্টাদশ দিবসে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়। তাহাতে আচার্য্য মহাশয় যে ব্যাখ্যা করেন এবং যে সকল ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয় তাহা প্রকাশিত হইল।"[৪৬]

১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রায়পুরের সিংহ পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা হয়েছিল। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"রায়পুর গ্রামে একদিন ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু রবীন্দ্রনাথ সিংহ ভায়াকে অনুরোধ করায় তিনি উপাসনা সভার উদ্যোগ করেন। ২২শে পৌষ বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র হেডমাষ্টার মহাশয় এবং আশ্রমে আগত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বাবু বিনোদবিহারী রায় সমভিব্যাহারে আমি প্রতাপবাবুর হাটপুকুরের বাগানবাটীতে উপস্থিত হই। রায়পুরের প্রধান জমিদারবাবু গৌরাঙ্গ সুন্দর সিংহ মহাশয়ের আটচালাতে অপরাহ্ন কালে সভার অধিবেশন হয়। সকলেই সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। প্রায় ৫০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীত ও কীর্তনের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি উপাসনা করি এবং ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ হইতে কিছু ব্যাখ্যা করি। বিনোদবাবুও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। মহর্ষিদেবের উপহার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। যাহাতে প্রতিমাসে এই গ্রামে ব্রহ্মনাম হয় সেজন্য অনেকে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"[৪৭]

অঘোরবাবু প্রত্যক্ষভাবে রায়পুরে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও রায়পুরে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এই সিংহ পরিবার সেকালে বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসী হলেও তাঁদের উদার মানসিকতা, শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্মান জানাতেন। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক পারিবারিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পর দেবেন্দ্রনাথের শুভার্থীদের মধ্যে রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় ছিলেন অন্যতম। এর পরেই শ্রীকণ্ঠ সিংহের কলকাতায় যাতায়াত বৃদ্ধি পায় এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর উভয়ের সম্পর্ক আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। উভয়েই ঈশ্বরীয় ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠেন। শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের অবদান নিয়ে কোন মূল্যায়ন আজও হয় নি।

শান্তিনিকেতনের নির্জন সাধনক্ষেত্রে একমাত্র সঙ্গী ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। রায়পুরে থাকাকালীনও শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও মহর্ষির অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথাও জানা যায়। মহর্ষিদেব তাঁকে বলতেন 'শান্তিনিকেতনের বুলবুল'। তাঁর সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের অতন্দ্র প্রহরী এখানকার বাগিচার ফুলশাখাতে দোলা দিয়ে গান গাইতেন তিনি—"নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরাম। হৃদয় কমল বিকাশে যাঁর নাম।" শান্তিনিকেতনের ছাতিমগাছের ছায়াতে আজও তিনি রয়ে গেছেন।

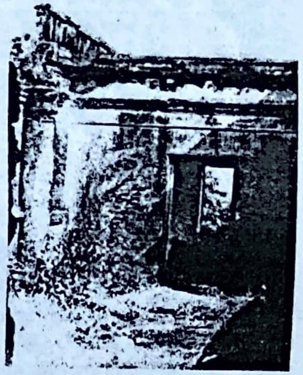

রায়পুরের দালান কোঠায় মহর্ষিদেবের আবাসগৃহ

মহর্ষিদেবের থেকে বয়সে বড়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রায় সমবয়সী হলেও মহর্ষির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মহর্ষি লিখেছেন—"আপনার

বিরহে এ শান্তিনিকেতন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। আর এখানে তেমন গোলাবফুল ফুটে নাই। যদিও দুই একটা গোলাবফুল ফুটে তাহার আর মর্যাদা নাই। আজ আমার আত্মা উদাস তাহার প্রতি আর কে দেখে? এই সময়ে একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিন এই আমার প্রার্থনা।"

শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়কে লেখা মহর্ষির পত্রগুলি অনুরাগরঞ্জিত। ধর্মশালা পর্বতে গিয়ে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষিদেব লিখেছেন।—

"সমালিঙ্গন পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

গত বৎসরে এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনাদের পুষ্পকাননে অশোকবৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রাতঃকালে আপনার উদার হস্ত হইতে যে কৃপা ও প্রেম আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম আজি কয়েক দিবসাবধি হইল তাহা মনে আন্দোলিত হইয়া এই পর্ব্বতের অরণ্য মধ্যে অন্তশ্চক্ষুতে আপনাকে দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনার চির পরিচিত বর্ণাবলী বিন্যস্ত পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমার হস্তগত হইবামাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য ও চমকিত হইলাম এবং যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আত্মার সহিত আত্মার কি প্রেমযোগ সে শরীর ব্যবধান মানে না। আমি আপনাকে স্মরণ করিবামাত্র আপনার পত্র যেন আমার হস্তে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। এই পত্রে আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন এই সংবাদ লাভ করিয়া মনের হর্ষ আরো দ্বিগুণিত হইল। এমনি শুভ সংবাদ যেন সর্বদা পাই।

রায়পুরে প্রাচীন পুষ্পকাননের ধ্বংসাবশেষ

মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এই পর্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্যের কিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। 'নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরাম। হৃদয়কমল বিকাশে যাঁর নাম। গগনে ভানু সহস্রকর বিস্তারি জগৎ মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশে। দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর জিনিয়া সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে।' কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্পকাননে—আর কোথায় অদ্য এই প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পদ লিখিতেছি। আবার আগামী বৎসরের এই সময়ে যে কোথায় থাকি তাহা কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে আমাকে ডাকিতেছেন 'তু আওরে'। কিছুই বলা যায় না হয়ত 'আগন ফাগন মে তুমসে মেলৌঙ্গি। আওর মন কি কমল দল খেলিয়া শুনৌঙ্গি।' সম্প্রতি এখান হইতে আমি সমুদয় হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে মনের মত আপনার সাধুসঙ্গ লাভ হউক এবং আপনি পুণ্যপুঞ্জেতে পবিত্র হইয়া ভগবৎ প্রেমধন আধিকারিক সর্বদা সঞ্চিত করিতে থাকুন। আপনার স্নেহময়ী দুহিতা ও প্রাণতুল্য জামাতা

সপরিবারে চিরঞ্জীবী হইয়া সর্বদা সর্বত্র কুশলে থাকুন এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করুন। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীন
ও
সতত কৃপাপ্রার্থিনঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।"[৪৮]

মহর্ষিদেবের জীবনীকার অজিত চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন "শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গ লাভ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিরস স্ফূর্তি হইত। তখন ধ্যানযোগের শান্তিময় অনুত্তরঙ্গ অবস্থা দূর হইয়া পুলক, নৃত্য প্রভৃতি রসভাবের উদ্বেল অবস্থা দেখা দিত। ...শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যোগ ও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হইয়াছিল।"

মহর্ষিদেবের পত্রাবলী থেকে জানা যায় তিনি রাজনারায়ণ বসু, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের মতো শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়কে কি গভীরভাবে ভালোবাসতেন, কি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তাঁদের মধ্যে। ভাবের উচ্ছ্বাসে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন প্রকাশিত হয়ে পড়ত।" একবার মাঘোৎসবের সময় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের লোক সমারোহের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় ভাবে মত্ত হইয়া এক ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথ রচিত এই গানটি গাহিয়াছিলেন।

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।
পাপনাশ হেতুরেষ ন তু বিচার বাগবলম্।।
দর্শনস্য দর্শনেন নো মনোহি নির্ম্মলম্।
বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলম্।।"

শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ বর্ণনা করেছেন (অজিত ৫৫০) দুইজনে 'হাত ধরাধরি করিয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়া ঐ এক গান "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" করিতে করিতে একবার উঠিতেছেন আবার বসিতেছেন।... যেদিকে চাই দেখি সকলেই ভাবাবেশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।"[৪৯]

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন—"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, একবার এক ব্রাহ্ম সম্মিলনের সভায় তিনি (অর্থাৎ শিবনাথ শাস্ত্রী) ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে তাঁহার একটি রচনা পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখেন, এক জায়গায় তাঁহার একটি রচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় হাত ধরাধরি করিয়া "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছ সকলং" এই গান গাহিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।"[৫০]

মহর্ষিদেবের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংহের সম্পর্কটা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তার ছবিটি রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে চিত্রিত করেছেন। বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের জীবনদেবতা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্তরতর অন্তরতম যিনি, তাঁকেই তিনি দেখতে পেতেন মহর্ষির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইনি আমার পিতার ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দী গান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে—'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়'। এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন, "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে"—আবার পাল্টাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন, "অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।"

শ্রীকণ্ঠ সিংহ যখন অতি বৃদ্ধ জরাতুর, তখন তিনি শেষ যাত্রার আগে মহর্ষিদেবকে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। সেজন্য রায়পুর থেকে চুঁচুড়ায় কন্যার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তখন মহর্ষিদেব সেখানে ছিলেন।

শেষযাত্রার কালে চোখ খুলে দেখার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। চোখের পাতা আঙুল দিয়ে তু… তিনি মহর্ষিদেবকে দেখেন। বহুকষ্টে মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করেন। 'কি মধুর তব করুণা প্রভো… গেয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনস্মৃতিতে এই শেষ যাত্রার চিত্রটি সজীব করে… ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষিদেবের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংহের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক যে প… রচিত হয়েছিল তা যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ছাড়া সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতাপনারায়ণের গুরুদেব। আর শ্রীকণ্ঠ সিংহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হলেও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্তরতম আপনজন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের গুরু এবং 'ঠাকুরদা চরিত্র' রূপায়ণে শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ, বালক রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

'জীবন স্মৃতি'র পাতায় শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ব বোম্বাই আমটির মতো—অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথাভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না। বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাসিতে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংহের ছবিটি ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই ছবিটিই কবির প্রথম ছবি। ছবিটি রায়পুরের সিংহ পরিবারে রক্ষিত ছিল। রায়পুরের সিংহ পরিবারের প্রসঙ্গে ১৯৬৪ সালে অলোককুমার সিংহ মহাশয় লিখেছেন—"আমাদের বাড়িতে শ্রীকণ্ঠবাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কোন দাদার জরির টুপি মাথায়, মখমলের পোষাক পরা ফটো চিত্র ছিল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে তাহা কর্তৃপক্ষ লইয়া গিয়াছেন।"

এই ছবিটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বেশ মনে পড়ে, তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজ ছবিওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দীতে বাংলাতে তিনি এমনি আলাপ জমাইয়া তুলিলেন—অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন, "ছবি তোলার জন্য অত বেশি দাম আমি কোনোমতেই দিতে পারিব না, আমি গরিব মানুষ—না না সাহেব, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না"— যে সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল।"

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন শ্রীকণ্ঠ সিংহের নির্মল চরিত্রটি—"অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না।" কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। "এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না।"

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের বন্ধু, রসিক শ্রোতা হিসাবে তাঁকে দেখলেও কবির সঙ্গীত শিক্ষার গুরু হিসাবেও তাঁর কম অবদান ছিল না। এজন্য সঙ্গীতের গুরু শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে কবি বলেছেন—"গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল—'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'। ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ' সেইখানটিতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশান্তভাবে সেটা ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"[৫১]

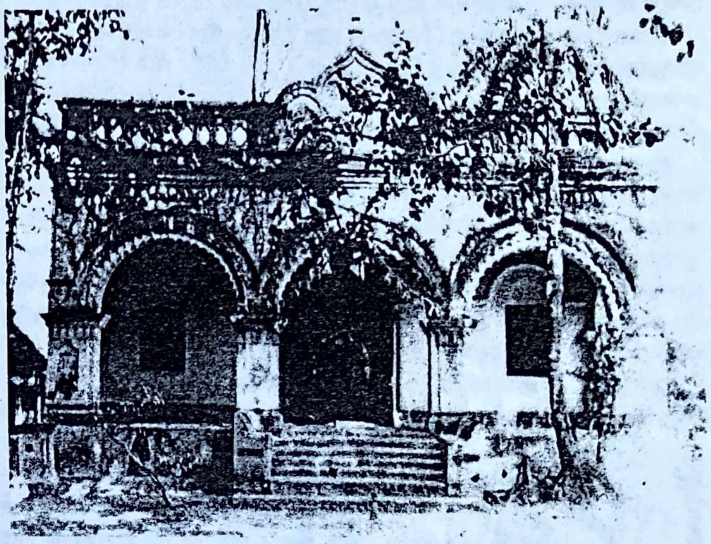
হাটপুকুরে দেবী কালিকার মন্দির (সাধক বামাক্ষেপা প্রতিষ্ঠিত)

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের প্রভাব যে কতদূর প্রসারিত ছিল তা অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে। 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে পদাবলী রচনা করে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকুলের অন্যতম পদকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামের মধ্যেই শ্রীকণ্ঠ সিংহের 'সিংহ' পদবিটিই যে সংগীত গুরু শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রীকণ্ঠ সিংহ যে 'ঠাকুরদা চরিত্রের প্রেরণা' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতায় রায়পুরের সিংহ পরিবারের নানা ঘটনা, স্থান কাল পাত্রের সাহিত্যিক রূপায়ণ ঘটে গেছে তারও অনেক ইঙ্গিত আছে।

শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্তের মূল্যায়ন হলে দেখা যাবে 'গড়ারযুগে' রায়পুরের সিংহ পরিবারের কী অবদান ছিল। মহর্ষিদেবের সময় থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সিংহবাড়ির কী গভীর সম্পর্ক ছিল।

১৯৫১ সালে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর সাবেকী সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ে। শুধু গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়—উভয় পরিবারের আত্মিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। নচেৎ ঠাকুর পরিবারে শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের অবাধ প্রবেশাধিকার সহজে হতে পারত না। শান্তিনিকেতনে শ্রীকণ্ঠ সিংহের উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধান ছিল বলেই মহর্ষির সাধনস্থল সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল।

মহর্ষিদেবের শিষ্য প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের 'হাটপুকুর বাগানবাড়ি' ছিল রায়পুরে। প্রতাপনারায়ণের কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ সিংহ এখানে দেবী কালিকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বীরভূমের 'তারাপীঠের সাধক বামাক্ষেপার' শিষ্য ছিলেন। 'সাধক বামাক্ষেপা' এই মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী বেদীর উপর কালিকা দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। বামাক্ষেপার প্রদত্ত ত্রিশূলটি দেবীর নিকট প্রোথিত রয়েছে।

মহর্ষিদেবের প্রয়াণের পরে পরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চাকর উমেশকে সঙ্গে নিয়ে রায়পুরের হাটপুকুরে চলে আসেন। হাটপুকুরের উত্তর পাড়ে একটি মাটির বাড়িতে তিনি থাকতেন। বাড়িটি এখন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানে কিছুদিন থাকার পর তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ পিতাকে শান্তিনিকেতনের 'নীচুবাংলো'-'দ্বিজবিরাম' বাড়িতে নিয়ে আসেন।

রায়পুরের হাটপুকুরের দেবী কালিকার মন্দির সাধক বামাক্ষেপার আগমনে খ্যাত হয়ে ওঠে। অনেক সাধক ও গুণীজনের আগমন ঘটত এখানে। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন শান্তিনিকেতন থেকে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেকেই এখানে আসতেন। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এখানেই পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় সূত্রেই দ্বিপেন্দ্রনাথ হরেকৃষ্ণবাবুকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানান। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনগৃহে। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের অপ্রকাশিত দিনলিপিতে তার উল্লেখ রয়েছে।

মহর্ষির শান্তিনিকেতনের বর্তমানে যে বৃহত্তর ভৌগোলিক আয়তন আমরা দেখছি তার রূপকার বলতে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম অগ্রগণ্য। সেই সঙ্গে রায়পুরের সিংহ পরিবারের অবদান যে কতখানি ছিল তার হিসাব করা যাবে না। এছাড়া জানা অজানা পরিবার ও ব্যক্তিদের অবদান কম নয়। শুধু শান্তিনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধিই নয়—শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়ি ও পূর্বপল্লীর বৃহত্তর মাঠটি বিশ্বভারতীর অধিকারে আনার ব্যাপারে রায়পুরের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের কী প্রচেষ্টা ছিল তার মূল্যায়ন আজও হয় নি। অর্থাৎ সিংহ পরিবারের আন্তরিক উৎসাহে মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দানের দশ সহস্র টাকায় রবীন্দ্রনাথ 'সিংহসদন' নির্মাণ করিয়ে উভয় পরিবারের স্মৃতিকে রক্ষা করেছেন। এসব কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেকখানিই অজানা। সিংহসদন সংস্কার কালে গৃহটির শীর্ষদেশে সিংহের মূর্তি তৈরি করে বোধহয় সেই স্মৃতির বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীতে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এছাড়া রায়পুরের সিংহ পরিবারের বংশপরিচয়ে অনেক অজানা ঘটনা ও তথ্যাবলী রয়েছে যা দিয়ে নতুন করে মূল্যায়নের অবকাশ আছে। (দ্রঃ সত্যেন্দ্র স্মরণে—কুমারী স্বপ্নারাণী সিংহ—সিতিকণ্ঠ বিদ্যালয় থেকে ১৯/০১/৬৪ সালে প্রকাশিত)।[৫২]

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

পরিশেষে বলা যায় রায়পুরের সিংহ পরিবারের ও তাঁদের আত্মীয়বর্গের যে বিষয় সম্পত্তির পরিচয়পত্র রয়েছে (পর্চাপত্র) তাতে একটা অদ্ভুত তথ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। সিংহ পরিবারের জমিদারিতে বিভিন্ন মৌজার বিশেষ করে বোলপুর, বাঁধগড়া, ভিন্ন বাঁধগড়া প্রভৃতিতে মোট ষোলো আনা অংশের মধ্যে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৈলবালা দেবী, মৃণালিনী দেবী, প্রমিলাবালা দেবীর অংশও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এসব তথ্য থেকে জানা যায় রায়পুরের সিংহ পরিবার রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুরবাড়ির প্রতি কী অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। এঁদের পর্চাপত্র গুলিতে বিভিন্ন দাগ ও খতিয়ানে গুরুপুত্র রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির অংশীভূত করে ১৩।০ খাজনাযোগ্য অংশ দান করেছিলেন। এসব তথ্য রয়েছে রায়পুরের সিংহ পরিবারের ব্রহ্মপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের কন্যা রূপমঞ্জরীর বংশধর বিশ্বভারতীর পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক "পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পুত্র সুরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের পারিবারিক দলিল পত্রে। এসব পর্চা ও তথ্যাদি থেকে সেকালের শান্তিনিকেতনে প্রাচীন ঘরবাড়ি, রাস্তা, ইন্দারা, খেলার মাঠ, প্রভৃতির নাম জানা যায়। এ নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।[৫৩]

রূপান্তরে শান্তিনিকেতনের ইতিবৃত্ত আজও অনালোচিত অধ্যায় বলে মনে করি। সহৃদয় পাঠক, গবেষকগণের কাছে বিচারের ভার অর্পণ করে যথার্থ মূল্যায়ন প্রত্যাশা করছি। কারণ সিংহ পরিবারের অন্যান্য শরিকগণের দলিল পর্চাতেও এমন আরও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হলে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী সম্পর্কে যথার্থ গবেষণা হতে পারে।

তথ্যসূচি ঃ

১. হিমালয় যাত্রা—আত্মজীবনী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৫৪
৩. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্তী। পৃঃ ৪৪২
৪. রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী। পৃঃ ১৭
৫. রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫২৭
৬. শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৭
৭. রবীন্দ্রভবন সংরক্ষিত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের পাট্টাপত্র।
৮. ভুবনসাগর প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের ফলক—ভুবনডাঙ্গা গ্রাম।
৯. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৫৫
১০. শান্তিনিকেতন আশ্রম— অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫
১১. ঐ — ঐ ও ঐ। পৃঃ ১০০-১০১
১২. ঐ — ঐ ও ঐ। পৃঃ ৯৮-৯৯
১৩. শব্দকল্পদ্রুম। সপ্তপর্ণ দ্রঃ
১৪. শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (দ্বিতীয় খণ্ড)—উপেন্দ্রকুমার দাস। পৃঃ ৭৬৪
১৫. শান্তিনিকেতনে শান্তিনিকেতন গৃহ নির্মাণের কাজ—চিত্তরঞ্জন দেব—রাঢ়ভূমি— মার্চ ১৯৮০।
১৬. রবিজীবনী প্রথমখণ্ড—প্রশান্তকুমার পাল। পৃঃ ৫৭
১৭. পারিবারিক সূত্র। বীরেন্দ্রকুমার দাস—বোলপুর, বীরভূম।
১৮. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৫৫
১৯. শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৫-১৬
২০. ঐ — ঐ ঐ পৃঃ ১৭
২১. পারিবারিক সূত্র। —অজিতকুমার মণ্ডল—পারুলডাঙ্গা, বীরভূম।
২২. পুরানো সে দিনের কথা—প্রমথনাথ বিশী। পৃঃ ১
২৩. শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫

২৪. ঐ — ঐ ও ঐ। পৃঃ ৪৩-৪৯
২৫. ঐ — ঐ ও ঐ। পৃঃ ৫৪
২৬. দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের খতিয়ান—শোভন সোম।— পৃঃ ১৮
২৭. শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৬২-৬৩
২৮. ঐ — ঐ ও ঐ। পৃঃ ৯০-৯৩
২৯. ঐ — ঐ ও ঐ। পৃঃ ১০৯-১১০
৩০. রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫০৯
৩১. ঐ — ঐ। পৃঃ ৩৬-৩৭
৩২. আর্যসমাজ কলিকাতা শতাব্দীর ইতিহাস—আচার্য্য প্রিয়দর্শন—বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত উমাকান্ত উপাধ্যায়—আর্যসমাজ কলিকাতা প্রকাশক।
৩৩. সত্যার্থ প্রকাশ—মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী (বঙ্গানুবাদ)। -ভূমিকা
৩৪. মহর্ষির শান্তিনিকেতনে আশ্রমধারী অচ্যুতানন্দ মিশ্র—বুদ্ধদেব আচার্য 'খোয়াই' সংখ্যা ১৩, ২৫শে বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ—শান্তিনিকেতন।
৩৫. শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদর্শ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র ও প্রবন্ধ সংকলন বিশ্বভারতী। পৃঃ ৫৯-৬০
৩৬. প্রেতি পত্রিকা দ্বিতীয় সংখ্যা—১৩৯৪।
৩৭. পৌষমেলা—১৮৯৪-১৯৯৪ (শতবর্ষ) ১৪০১ বঙ্গাব্দ বিশ্বভারতী।
৩৮. ঐ — ঐ ঐ।
৩৯. শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৮-৯
৪০. সুরুল নথি সংকলন—প্রথম খণ্ড—বুদ্ধদেব আচার্য—বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি—১৯৮৩। পৃঃ ৫৬৩-৫৮৩
৪১. সুরুল নথি —১৮৩৫-৩৮ খৃষ্টাব্দ—লিপিকায় সংরক্ষিত।
৪২. সুরুল নথি সংকলন—প্রথম খণ্ড—বুদ্ধদেব আচার্য—বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি—১৯৮৩। পৃঃ ৬৫৩-৫৮৩
৪৩. শান্তিনিকেতন আশ্রমের নেপথ্যভূমি—অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল—স্মারকপত্র—রজতজয়ন্তী—বাংলা বিভাগ—২০০০ খৃঃ
৪৪. রায়পুরের ভগ্ন অট্টালিকায় প্রতাপনারায়ণ সিংহের স্বহস্ত লিখিত ব্রাহ্মধর্মের কথা।
৪৫. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮ই চৈত্র, ১৭৮৩ শকাব্দ, পৃঃ ১৯।
৪৬. ঐ — ঐ।
৪৭. শান্তিনিকেতন আশ্রম—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৬৬-৬৭
৪৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্রাবলী) — অজিতকুমার চক্রবর্তী। পৃঃ ২১৯-২০
৪৯. ঐ — ঐ। পৃঃ ৪৪৫
৫০. মহর্ষির আত্মজীবনী—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ৩৪৬-৪৯
৫১. শ্রীকণ্ঠ সিংহ—জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫২. সত্যেন্দ্র স্মরণে—কুমারী স্বপ্নারাণী সিংহ। রায়পুর-১৯৬৪ খৃঃ
৫৩. সুরঞ্জন ঘোষ—(বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন) মহাশয়ের পারিবারিক দলিল পর্চাতে প্রাপ্ত তথ্য।

** ১। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত ছবিগুলি প্রবন্ধে ব্যবহারের অনুমতি পাওয়াতে বিশ্বভারতীর নিকট আমার ঋণ স্বীকার করছি।

২। প্রবন্ধে ব্যবহৃত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছবিটি তাঁর প্রপৌত্র অধ্যাপক সতীন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ছবিটি তাঁর পৌত্র মনোজ কুমার ভট্টাচার্য দিয়েছেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।